একটা কেউটে সাপের ছানার সম্মুখে পড়ে, সাপটী তাহার আঙ্গুলে কামড়ায়। সে অমনি ঝাঁ ক'রে তাহার ঘাস কাটা খুর্পা দিয়া আঙ্গুলটী কাটিয়া ফেলিল, কাজেই বিষ আর না উঠিতে পারায় সে বাঁচিয়া গেল। আঙ্গুলটী বিষে জরিয়া সেখানে পড়িয়া রহিল। কদিন পরে আবার সেখানে আসিয়া দেখিল যে সেই আঙ্গুলটী তথায় রহিয়াছে, নির্ব্বোধ ঘেসেড়া মনে করিল এখন আঙ্গুলটী আবার জোড়া দিলে হয়। এই মনে করিয়া যেমন তাহা সেই কাটা যায়গায় জোড়া দিয়াছে, অমনি সেই বিষ উঠিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। হায়! হায়!! বুদ্ধির দোষে বেচারা মারা গেল, প্রাণটী হারাইল। অবোধ সাধনেরও ঠিক সেই দশা হইল। কুসঙ্গের বিষে তাহার সর্ব্বনাশ হইত, হঠাৎ সে সঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাঁচিবার আশা হইল, অমনি আবার লোভে পড়িয়া যেই সে কুসঙ্গে আসিয়া জুটিল, আর তখনি আবার সেই পুরাণ বিষ তাহার মনে চড়িয়া সর্ব্বনাশ করিল, সে আবার যে সেই হইয়া দাঁড়াইল!!

খুব আমোদে দিন ত কাটিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। সকলে বাড়ী গেল। এইবার সাধনের মহাবিপদ। এতক্ষণের পর তাহার চৈতন্য হইল, এতক্ষণের পর তাহার পিতার স্নেহ মনে পড়িল, যাইবার সময় প্রাতে যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, তাহার বুক "ধপ্-ধপ্" করিতে লাগিল। মুখ শুকাইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনের মধ্যে যে তাহার কি হইতে লাগিল, তাহা তোমরা বুঝিয়া লও। "যদি বাবা বাড়ী আসিয়া থাকেন, আমাকে খুঁজিয়া পান নাই। গিয়া কি বলিব? কি করিব? কি হইবে? হায়! হায়!! কেন গেলাম? কি ছাই আমোদ করিলাম? কেন গেলাম? কি করিলাম?" সে আর বাড়ীর দিকে যাইতে পারে না। পথের ধারে দাঁড়াইয়া কাপড়ের এক কোণ লইয়া দাতে চিবাইতেছে আর মাটির দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে।

তাহার ছোট বোন্ বাহিরে আসিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা বাড়ী এসেছেন?" সে বলিল "না", তখন অনেক ভরসা হইল। চক্ষু মুছিয়া চোরের মতন আস্তে আস্তে পড়িবার ঘরে গিয়া যে কায্য দিয়া গিয়াছেন তাহা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে হবে কেন? একদিনের কায কি কখন এক ঘণ্টায় হয়? হইল না।

একটী দুষ্কার্য্য করিলে আরও শত দুষ্কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। সাধনের তাহাই হইল। একে পড়া হয় নাই, তাহাতে আবার বদ্ ছেলেদের নিকট গিয়াছে, বাবা শুনিলে মহা রাগ করিবেন, হয়ত একেবারে সব কাড়িয়া লইয়া দূর করিয়া দিবেন। ভয়ানক রাগ হইবে। তাহার চেয়ে সাধন একটা সোজা উপায় দেখিল। যা হবার তা ত হইয়াছে। এখন আর কখন এমন করিবে না, কিন্তু আজিকার মত এখন বাচে কিরূপে? মিছা কথা। কি? মিছা কথা? যাহা কখন কহে নাই? যে দোষ কখন হয় নাই?—কাজে কাজেই!! সাধনের পাপের চূড়ান্ত হইল! সর্ব্বনাশ পূর্ণ হইল!! পিতা আসিলে সমস্ত মিথ্যা কথা বলিয়া ঢাকিয়া ফেলিল!

কিন্তু বলিবার সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল বুঝিতেই পারিতেছ? বুকের ভিতরে কে যেন ঢেকী পাড়িতেছিল, মনের মধ্যে যেন একটা নরক ঢাকা রহিল। সেদিন রাত্রে তাহার ঘুম হইল না, চক্ষের জলে বালিশ ভাসিয়া গেল, সমস্ত রাত কাঁদিয়া কাটাইল। আর সাধনের মুখে হাসি নাই, আর তাহার মনে সুখ নাই।

সে ঘটনা প্রায় এক মাস হইয়া গিয়াছে, আজিও সে এক বারও হাসে নাই, শরীর শুকাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সকলেই মনে করে, তাহার কি কঠিন রোগ হইয়াছে, সর্ব্বদাই অন্যমন হইয়া ভাবে। কদিনের মধ্যে কি যেন হইয়া গেল। তাহার পিতা একদিন খুব আদর করিয়া কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে এরূপ হইতেছে? অনেক কষ্টে বালক সমস্ত বলিয়া ফেলিল। "হু হু" করিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল, সে একেবারে পিতার পদতলে পড়িল এবং সমস্ত বলিয়া শাস্তি চাহিল। পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবধি সাধনের জীবন নূতন হইয়া গেল। এখন সেই বালক একজন মান্য গণ্য দেশের বড়লোক। তাহার চরিত্রের গুণে সে অঞ্চলের অধিকাংশ লোক ধর্ম্মের পথ গ্রহণ করিয়াছে। বালক বালিকাগণ! কি শিখিলে? কখন ভুলিও না।

ঠাকুরদাদার গল্প।

আজ আবার নবীন বাবু সকলকে লইয়া তাঁহার বড় দীঘিতে একখানা ছোট জালিবোটে করিয়া বেড়াইতেছেন; বড় ছেলেরা সব দাঁড় বাহিতেছে, ছোটরা মজা করিয়া বসিয়া আছে, বুড়ো মানুষ হাল ধরিয়া চালাইতেছেন। বোটে বেড়াইতে যাবার নাম শুনিয়া আজ অনেক গুলি ছেলে আসিয়া যুটিয়াছে। ও পাড়ার চারু, চাটুর্য্যেদের যদু ইত্যাদি কত যে আসিয়াছে তার ঠিক নাই, প্রায় দশ পনেরো জন। বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, কেউ গান করিতে পার?" সকলে বলিল চারু পারে। তখন সকলে পরম সুখে মনের আনন্দে সূর্য্য অস্ত যাবার সময় সূর্য্যের রাঙ্গা ছবিখানির দিকে চাহিয়া সেই বিষয়ে চারুর একটী সুন্দর গান শুনিতে শুনিতে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সে যে কি আনন্দ তা আর বলা যায় না।

বেড়ান হয়ে গেলে গল্প আরম্ভ হবে, সকলে বসিলেন। কিশোরী বলিল "দাদা! সেদিনকার কথাটা সব বুঝেছি, একটুখানি গোল আছে। ঐ যে বলেছিলে হাল্‌কি আর ভারী বাতাস,—সেখানটা আমি ভাল বুঝি নাই। বাতাস ত সকলের চেয়ে হাল্‌কি, এর আবার হাল্‌কি ভারী কি হবে? বাতাস কি ওজন করা যায়?" সেদিন স্থির হল সেই বিষয়েই বলা হবে। তখন নবীন বাবু বলিলেন, একথা ত এখানে ভাল হবে না, বাড়ী চল, আমার ঘরে যন্ত্র টন্ত্র আছে, তাহাতে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। অমনি সকলে হৈ হৈ শব্দে খেলার আমোদে উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে নবীন বাবুর (Experiment room) পরীক্ষাগৃহে সকলে প্রবেশ করিয়া একটা গোল টেবিলের চারিদিকে এক একখানা চেয়ারে বসিল। নবীন বাবু বসিয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।—"সেদিনই বলিয়াছি যাহার পরমাণু আছে তাহারই ভার আছে। বায়ুর পরমাণু আছে সুতরাং বায়ুরও ভার থাকিবে। এত খুব সোজা কথা, কিন্তু এ কথা সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। তোমরা মন দিয়া শুন, বেশ্ বুঝিতে পারিবে। বাতাস যে ভারী বটে, এ আর কি প্রমাণ দিব; যদি দেখাইতে পারি একদিকে বাতাস, আর একদিকে অন্য একটা ভারী জিনিষ—দুই ওজন করিলে সমান হয়, তাহ'লে হয়, কিন্তু তা কেমন কোরে হবে। আচ্ছা, এক কর্ম্ম করা যাক। এই যে বড় বোতলটা, এটার মধ্যে বায়ু আছে ত? এটাকে ওজন করি। (করিলেন)। দেখ ঠিক আধ সের

হ'ল। আচ্ছা, এইবার 'বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র' দ্বারা এর ভিতরের বাতাস খানিকটা বাহির করিয়া লই— বলিয়া একটা যন্ত্রের ছেদায় বোতলের মুখ দিয়া, একটা হাতল নাড়িতে লাগিলেন। খানিক বাদে বোতলের মুখের কাছে একটা "ষ্টপ্ কক্" বা স্ক্রু দেওয়া ছিপি আঁটিয়া দিলেন, সেটা আগেও ছিল, কিন্তু খোলা ছিল। তার পর যন্ত্র থেকে খুলিয়া লইয়া আবার ওজন করিলেন।—ঐ যাঃ! হাল্কি হয়ে গেছে! তারপর দাদা বাবু বলিলেন "দেখিলে, বায়ু বাহির করিয়া লইয়াছি, আর হাল্কি হয়ে গেল, যদিও খুব কম, তবু হাল্কী ত হল বটে? তবেই দেখ, বাতাসের ভার আছে। আবার যদি ঐ "কনডেন্সার' যন্ত্র (condenser) দিয়া উহার ভিতর খুব বাতাস পুরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আবার বেশী ভারী হবে। বুঝিলে?" সকলে বলিল, "হাঁ একটু একটু"। চারু জিজ্ঞাসা করিল, বায়ুর ভার মাপিবার জন্য না "ব্যারমিটার" নামে কি যন্ত্র আছে? সেইটার বিষয় বুঝাইয়া দিবেন কি?"

নবীন বাবু বলিলেন "আমি আজ সেই কথা বলিব বলিয়াই মনে করিয়াছি। আমি যাহা যাহা বলি, কর দেখি। দুহাত লম্বা একটা কাচের নল লইয়া এস, (চারু আনিল), ঐটা জলে পূর্ণ কর, তারপর উপুড় করিয়া টেবিলের উপর ধর। ঐ! সব জল যে পড়িয়া গেল?" কিশোরী—"তা ত যাবেই, জল যে গড়িয়ে পড়িবে। নলটার একটা মুখ যে বন্ধ, আর একটা মুখ যে খোলা, তাই সব জল পড়ে গেল।" নবীন বাবুঃ—"বেশ, আবার সোজা ক'রে জলে পূর্ণ কর, তারপর এই জলের বাটীতে উপুড় কর, দেখিও মুখটায় আঙ্গুল দিয়ে জলের মধ্যে রেখে তারপর ছেড়ে দিও। (কিশোরী তাই করিল) কৈ! এবার ত জল পড়িল না?"—সকলে অবাক্! কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

তখন নবীন বাবু আবার ঐ নলটা পারদে পূর্ণ করিতে বলিলেন। (পারা চক্‌চকে, খুব ভারী, পাৎলা এক রকম ধাতু)। তার পর একটা পারদের বাটিতে উপুড় করিয়া ধরিতে বলিয়া, বলিলেন— 'দেখিও যেন উপুড় করিবার সময় পড়িয়া না যায়, মুখে আঙ্গুল দিয়া ধর। আর নলটাও খুব ভারী হইয়াছে, জোরে ধরিও। ভাল, দেখ দেখি যেই আঙ্গুলটী টানিয়া লইয়া নলের মুখ খুলিয়া দিলে, অমনি হড়াৎ ক'রে খানিকটা পারা বাটীতে পড়িয়া গেল, কিন্তু সবটা না। ঐ দেখ একটু নামিয়াছে, (ছবি দেখ) পারদ কিন্তু এখনও নলের মধ্যে
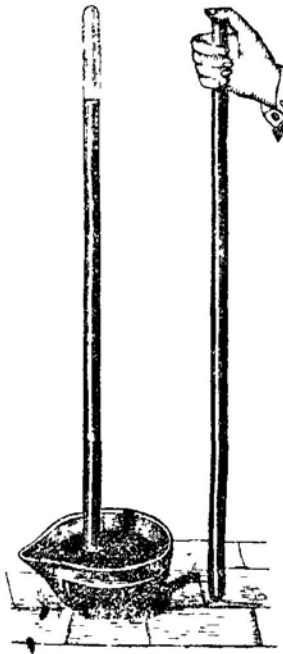
প্রায় ২৯।৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া খাড়া আছে। এর কারণ কি জান?" সকলে আরও অবাক্! কেহই উত্তর দিতে পারিল না।

তখন একটু হাসিয়া নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন "তোমাদের দোষ নাই, কতকাল কত চেষ্টা করিয়াও বড় বড় পণ্ডিতেরা ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কেহ বলিতেন 'কোন যায়গা একেবারে খালি থাকা স্বভাবের বিরুদ্ধ' তাই ঐ জল যে পড়িয়া যাইবে তাহার স্থান কে অধিকার করে? খালি থাকিতেও পারে না, এ জন্যেই জল পড়িতে পারে না, এই রকম কত লোকে কত রকম কথা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কেহই ঠিক কথাটী বলিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৬৪৩

ষোল শ তেতাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে ইটালি দেশের বথা'ত পণ্ডিত 'টরিচেলী' এই মহা গোলমেলে বিষয়টী মীমাংসা করিয়া দেন। তিনি অমনি একদিক বন্ধ একটী নল পারদে পূর্ণ করিযা অঙ্গুলি দিয়া তাহাব খোলা মুখটা চাপিযা ধরিলেন ও পরে তাহাকে পারদের একটা বাটিতে উলটিযা ধরিলেন। ধরিবামাত্র খানিকটা বাটিতে পড়িযা গেল, প্রায ৩০ ইঞ্চি পারদ উচ্চ হইযা নলের ভিতর রহিল, আর তাহার উপরটা খালি রহিযা গেল। (চিত্রের বাম দিকের নল দেখ) তখন তিনি ভাবিলেন এ কি রকম কথা? যদি 'স্থান খালি থাকা স্বভাবের নিযম বিরুদ্ধ' হয, তবে ৩০ ইঞ্চির উপরে কি সে নিযম খাটে না? নহিলে উপরে ঐ যে খালি উহা রহিল কেন? এই রূপে চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন তাঁহার আগেকার পণ্ডিতদের কথা নিশ্চয়ই ভুল। এর জন্য কোন কারণ অবশ্য থাকিবে। কি সেই কারণ? তাঁহার মতে স্থির হইল ইহার কারণ আর কিছুই নয, কেবল বায়ুর চাপ। পৃথিবীর উপরের বায়ুরাশি ঐ বাটির পারদের উপর চাপিযা রহিযাছে, তাই সেই চাপের জন্যই ঐ নলের ভিতরের পারদ নামিতে পারে নাই। ইহাই ঠিক কথা। তার পরে কত শত উপাযে 'টরিচেলী' সাহেব এই কথাটী সত্য বলিযা প্রমান করিযাছেন।"

"এখন মনে কর, পৃথিবীর উপরে আকাশে আর সমস্ত বায়ু নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিযাছি মোটামুটী প্রায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত বায়ু আছে বলা যায়। এই সমস্ত বাতাসটার ভার পৃথিবীর উপর রহিয়াছে। এমন কি পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিযাছেন ও আমরাও দেখাইতে পারি যে এক ইঞ্চি লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া স্থান টুকুর উপর প্রায় ৭½ সাড়ে সাত সের বায়ুর চাপ আছে; (সকলে:— "ও বাবা! তবে আমরা বাঁচি কি ক'রে, চাপে মরে যাই না কেন?") তা হলে হিসাব করে দেখ আমাদের হাতে, পায গাযে কত মন ভার চেপে রযেছে। তবু আমরা টের পাই না। মিছা মিছি এত ভূতের বোঝা বযে বেড়াচ্ছি অথচ টের পাই না, এত বড মজা। কিন্তু টের যে পাই না তার কারণ আছে, প্রথমতঃ চিরকাল ধরিযা এ অভ্যাস, এখানেই জন্ম, এখানেই বৃদ্ধি, এখানেই মৃত্যু, কাজেই সেটা বুঝিতে পারি না, আর দ্বিতীযতঃ যেমন উপরে ঐ বাতাস, তেমনি নীচেও বাতাস, ভিতরেও বাতাস, চারিদিকে বায়ু থাকাতেই কোন দিক থেকেই চাপ লাগে না। এ সব কথা এর পর আরও ভাল করে বুঝিতে পারিবে। এখন এই টুকু মনে রেখে দাও যে আমাদের মাথার উপর যে বায়ুর রাশি রহিযাছে তাহার ভার আমাদিগকে সহ্য করিতে হয। আমাদিগকে যেমন সহ্য করিতে হইতেছে তেমনি পুকুরের জিনিষকেও সেই রকম ভার বহিতে হয। আচ্ছা! এখন মনে কর একটা বাটীতে জল রেখে তার উপর ঠিক তার মুখের মতন একখানা ছোট রেকাবীর মাঝখানে একটা ফুটো করে, সেইটা চাপিযা ধরা যায,—তাহা হইলে কি হইবে?—(সকলে:—ঐ ফুটো দিযে হু হু ক'রে জল উঠিবে) বেশ্ কথা। এইবার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিবে। এখন মনে কর ঐ ফুটোটাতে যদি একটা কাচের নল বসান যায, আর তার পর ঐ রকম চাপ দেওযা যায তা হলে ঐ নলের ভিতর জলটা উঠিবে। কেমন?—ঐ রেকাবীটাকে যত চাপিবে, নলের ভিতরকার জলও তত উঠিবে, আর উহাকে যত আল্‌গা দিবে, জলও তত নামিবে।"

"এখানেও ঠিক সেই রকম হয। ঐ বাটিতে পাৎলা পারা রহিয়াছে। উহার উপর সেই রেকাবীটার মতন হযে উপরের বাতাস চাপা দিতেছে কাজেই পারা আর ত বাটিতে থাকিতে পারিবে না, উপরে উঠিবে। তাই ঐ নলের মধ্যে পারদ

খাড়া থাকে, সমস্ত নামিযা পড়ে না। একটা নরম কাদাতে কাচ দিয়ে চাপ দিলে ত সমান হয, উচু নীচু হয না; কেন?—না সব যাযগায চাপ পায। আব যদি সেই কাচেব মাঝখানে ফুটো থাকে তবেই না সেখান দিযে কাদা বেবোয? এও ঠিক সেই বকম। পাবাটাব সব যাযগায সাড়ে ৭½ সাড়ে সাত সেব কবিযা প্রতি "বর্গ ইঞ্চি" স্থানে চাপ হবে, তবে ত সেটা সমান থাকবে? (সকলে হাঁ।) বেশ্, এখন মনে কব একটা নল বায়ু শূন্য কবিয়া তাহাতে ডুবাইযা ধবিলাম। কি হবে? সে নলেব মুখটা যেখানে সে যাযগা থেকে নলেব মাথা অবধি বাতাস নাই, ফাঁক থালি। কাজেই বাহিবে যে বকম ৭½ সেব বাতাসেব ভাব পাচ্ছে সেখানটায তা পাচ্ছে না, সুতবাং সেইখান দিযে পাতলা পাবা উঠিতে থাকিবে,—যতক্ষণ সেখানেও বায়ুব বদলে পাবাব ভাব কি বর্গ ইঞ্চিতে ৭½ সেব ক'বে হযে না দাঁড়ায। বুঝিলে? (এবিষযটা বড় কঠিন পাঠকগণ ২।৩ বাব পড়িবেন)। এখন আমি যদি খালি বায়ুশূন্য নল না লইযা, পাবদ-পূর্ণ নল উহাতে ডুবাইযা ধবি, তখন কি হয? না ঐ পাবদেব মধ্যে যতটুকুব দবকাব ততটুকু থাকিযা যায, অর্থাৎ কি বর্গইঞ্চে ৭½ সেব যতটুকু পাবা সেইটুকু নলেব ভিতব উঁচু হইযা থাকে, বাকীটা বাটীতে পড়িযা যায। সকলেই জানে যে প্রায ৩০ ইঞ্চ লম্বা ও এক বর্গইঞ্চ মুখ এমন একটা নলেব মধ্যে যতটা পাবা ধবে তাহাব ওজন ৭½ সেব। কাজেই বুঝিতে পাবিতেছ যে কেন ঐ বড় নলটার ৩০ ইঞ্চ বৈ আর সব ফাঁক থাকে।"

অমূল্য:—"আচ্ছা ওখানে কি কিছু নাই?"

নবীন বাবু—"আছে, ওখানে পাবদের বাষ্প আছে। সে যা হউক, কাজের কথাটা বুঝেছ ত? না হয় আর একবার ভাল করে বলি, মন দিয়ে শুনে মনে রাখ। ঐ যে ছবি উহার নীচের বাটিটাতে পারদ আছে, আর ঐ নলেও পাবদ আছে। বাটিব পাবদেব সকল স্থানেই বায়ুর ভাব পাইতেছে, কেবল যেখানে নলটী বসান সেখানে নয। কিন্তু তেমন সেখানে ঐ ৩০ ইঞ্চি উচ্চ পাবদেব ভাব বায়ুব ভাবেব কার্য্য কবিতেছে। বুঝিলে? এখন বাযুব ভাব যদি অধিক হয় তাহা হইলে ঐ পাবদেব উচ্চতা বাড়িবে, কেননা বাহিবে জোবে চাপ পাইলে কাজেই নলেব ভিতবে পাবা উঠিবে। আব বায়ুব ভাব কমিযা গেলে পাবাও নামিবে। এই উঠা নামা দ্বাবা সুতবাং বেশ্ সুন্দব রূপে বায়ুব ভাব মাপা যায়। এই উদ্দেশে ঐ নলেব গায ১,২,৩, · · এমনি সব ইঞ্চিব দাগ দেওযা আছে, প্রত্যেক ইঞ্চিব দাগ আবাব ১০০ ভাগে বিভক্ত হইযা তাহাও দাগ দেওয়া আছে। কাজেই, যদি এক ইঞ্চিব ১০০ এক শত ভাগেব এক ভাগও পাবা নামে বা উঠে তাহাও বেশ্ পড়িযা বুঝা যায যে বায়ুব ভাব কমিল না বাড়িল। এই যন্ত্রের নাম "ব্যারমিটাব" বা বায়ুব ভাবমান যন্ত্র।"

চারু:—মহাশয! আমি একটু জিজ্ঞাসা কবিব—এই ব্যারমিটাবেব যখন এরূপ নিয়ম, বায়ুব ভাবেব জন্যই যদি পাবদ উঠে নামে, তাহাহইলে উচ্চ পর্ব্বতে ইহা লইযা গেলে ত ইহাব পারদ নামিয়া যাইবে, কেননা সেখানে এখান অপেক্ষা বায়ুর ভাব কম।"

মন্মথ:—"কেন সেখানে কম হবে?"

কিশোরী—"তা হবে না? বা! শুনলে মোটে ৫০ মাইল পথ উচ্চ বায়ু আছে, তাহাব মধ্যে থেকে পর্ব্বতের উচ্চতাটা বাদ দাও, তবেই সমস্ত ৭½ সের থেকে এই নীচেব বাতাসের ভারটা কমিযা যাবে কি না।"

মন্মথ:—"হাঁ হাঁ বুঝেছি। ঠিক বটে।"

নবীনবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "চারু তুমি যা বল্লে তাই ঠিক কথা। যখন বায়ুর ভারই

পারদের দাঁড়াইবার কারণ আর তাহাই যখন কম, তখন পর্ব্বতের উপরে ব্যারমিটারের পারদ নীচু হবে না ত কি? আর যথার্থই পর্ব্বতে না বেলুনে উঠে দেখা হয়েছে যে পারা নামিয়া পড়ে।

এখন বোধ হয় তোমরা সকলেই বেশ্ বুঝিলে যে বায়ুর ভার মাপা যায়, ও যে যন্ত্র দ্বারা মাপা যায় তাহাকে ব্যারমিটার বলে। আর এও বুঝিলে যে কিরূপে উহাদ্বারা এমন চমৎকার কাজ করা হয়।"

নলিন।—"দাদা, তুমি বড় শক্ত শক্ত কথা আজ কা'ল বল, একটু সহজ না হ'লে আমি বুঝিতে পারি না।"

কিশোরী—"বা! তাহলে আমরা কি করি? আমরা যেমন ক্রমে বড় হচ্ছি তেমনি বড় বড় বিষয় শিখিতে ইচ্ছা যায় না?

নবীন বাবু।—"আচ্ছা তুদনেরই মতন করে এবার গল্প ক'রব। আজ রাত্রি হয়েছে। বাড়ী যাও।—

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

সপ্তম অধ্যায়।

রদিন প্রাতে অজিৎ বাড়ীর সম্মুখের বাগানে 'বাজা'র সঙ্গে খেলা করিতেছিল। খেলাতে এতই মত্ত যে বাড়ীর ভিতরে একখানা গাড়ী গেল, তাহাও দেখিতে পাইল না। বলা বাহুল্য এই গাড়ীতে ললিত বাবু ও সুরমা দেবী আসিয়াছেন। অজিৎকে দেখিয়া সুরমা দেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ, ওকি অজা? আমার বোধ হয় ও ছেলে সে অজা নয়।"

ললিত বাবু।—না। ও কখনই সে ছেলে নয়। তেমন খোড়া রোগা ছেলে দুদিনের মধ্যেই কি অমন মোটা সোটা হৃষ্ট পুষ্ট হতে পারে?

যখন তাহারা দুজনে গাড়ীথেকে নামিতেছিলেন, তখন অজিৎ ঘোড়া দুটো দেখিয়া 'মামা বাবু আর মামী মা এসেছেন রে' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দাড়াইল। ললিত বাবু নামিয়াই ইন্দুরেখার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু! এ বোধ হয় সে অজা নয়?"

ইন্দু।—হ্যাঁ। অবিশ্যি সেই ছেলে। এমন বদলে গেছে যে দেখলে আর চেনা যায় না।

ললিত বাবু। ওমা! অজাকে দেখলে আর চেনা যায় না। অজা, কেমন আছ?

অজা বলিল 'ভাল আছি।'

ইহার পর ইন্দুরেখা সুরমা দেবীর হাতখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৌদিদি! কতদিন থাকবে বল।"

সুরমা। দুদিন। তার পর আমি বাপের বাড়ী গিয়া বাকী ছুটিটা কাটাব। তোমার বাড়ীতে বেশী দিন থাকা হল না। এবার এসে অনেক দিন থাকব।

ইন্দু।—তবে যাও। আমি মনে মনে কত আনন্দ ক'রছিলাম। দাদা! তোমাকে আমি বুঝি এই বলেছিলাম। দুদিনের জন্যে না এলেই তো হ'ত।

ললিত বাবু।—লক্ষ্মী দিদিটী! অত রাগ ক'র না। এইবারে এসে অনেক দিন থাকব।

অজা আস্তে আস্তে ললিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"মামা বাবু! মেনা কেমন আছে? ইটের চকের আর সকলে কেমন আছে?"

ললিত বাবু।—মেনা এখন খুব সুখেই আছে। তার বাবা এখন মদ টদ খান না। চাকরী করিতেছেন। এখন বিনোদ বাবুরা ইটের চকে নাই। মেনা এখনও আমাদের বাড়ীতে আসে। সে প্রায়ই তোমার কথা

জিজ্ঞাসা করে। ইটের চকের সকলে ভাল আছে। আচ্ছা! আমি এবারে গিয়ে মেনাকে কি বল'ব?

অজিৎ।—ব'লবেন আমি খুব সুখে আছি। আমার কোন কষ্ট নাই, কোন দুঃখ নাই। মাসী মা মেশো মশাই আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি অনেকটা পড়ে ফেলেছি। আমার কোন কষ্টই নাই, কেবল মাঝে মাঝে তার কথা মনে পড়ে দুঃখ হয়। আর তাকে ব'লবেন, যে সে আমায় মনে করে শুনে আমি বড় সুখী হয়েছি। আমি তাকে ভুলি নাই।

অজিতের প্রফুল্লতা দেখিয়া সুষমা দেবী ও ললিত বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। দাদাকে বৌদিদীকে লইয়া ইন্দুরেখা দেবী সমস্ত দিনটা আমোদে কাটাইলেন। সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ইন্দুরেখা তাহা টেরও পাইলেন না। বিকালে সকলে মিলিয়া আমোদে আহার করিলেন। সেদিন হাসির রোলে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেদিন সকলের মুখেই হাসির রেখা, ইন্দুরেখা দেবীর বিশেষ আহ্লাদ। আহার করিয়া সকলে বাগানে বেড়াইতে গেলেন। ইন্দুরেখা ফুল তুলিয়া বৌদিদীকে সাজাইয়া দিলেন এবং বৌদিদীকে এ গাছ ও গাছ দেখাইতে লাগিলেন। গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে চাঁদ আকাশে ফুটিয়া উঠিল, চারিদিক জ্যোৎস্নাময় হইল। তখন তাঁহারা সকলে ঘাটে আসিয়া বসিলেন। পুষ্করিণীতে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্ মিক্ করিতেছে, গাছগুলি জোনাকীতে ভরা। সে সময়ের দৃশ্য কি সুন্দর তাহা বলা যায় না। ঘাটে বসিয়া তাঁহারা কত গল্প করিতে লাগিলেন,—গল্পে গল্পে অনেক সময় কাটিয়া গেল। রাজাও এ দলের মধ্যে অবশ্য ছিল।

তার পরদিন ললিত বাবুরা যাইবেন। রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতেই ইন্দুরেখা দেবী আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইন্দুরেখা দেবীর ইচ্ছা যেন সন্ধ্যা না হয়,—সন্ধ্যা হইলেই দাদা বৌদিদী চলিয়া যাইবেন। কিন্তু সন্ধ্যা ইন্দুরেখা দেবীর কথা শুনিল না, বরং সেদিন সন্ধ্যা শীঘ্র শীঘ্র আসিল। যতই অন্ধকার হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখ ভার হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা কোন মতেই দাদাকে ছাড়িতে চায় না। মনে বড় সাধ ছিল যে এবার ছুটিটা দাদা বৌদিদীর সঙ্গে সুখে কাটাইবেন, কিন্তু তাহা হইল না। ইচ্ছা না থাকিলেও দাদাকে বৌদিদীকে ছাড়িতে হইল। যাবার সময় ইন্দুরেখার মুখ আরও ভার ভার হইল, চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ললিত বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে বলিলেন—"ইন্দু! তবে আমি আসি। কিছু মনে করিও না। ইচ্ছা ছিল, এখানে সমস্ত ছুটিটা থাকিব, কিন্তু থাকা হ'ল না। এবারে এলে অনেক দিন থাকব।"

ইন্দু।—তা আর থেকেছ। সব বারেইতো থাকবো বলে যাও।

সুষমা।—ইন্দু! তবে যাই। বড় দুঃখিত হয়েছ, না?

ইন্দুরেখা দেবী কিছু বলিলেন না, কেবল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে দাদা বৌদিদীকে নমস্কার করিয়া বিদায় দিলেন, এবং তাহারা চলিয়া গেলে, বিষণ্ণমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ললিত বাবুরা ইটের চকে ফিরিয়া যাবার কিছু দিন পরে একদিন একখানা চিঠি পাইলেন। চিঠিখানা রামদাসের হাতের লেখা। তাহাতে লেখা আছে—"মহাশয়! আপনি পত্রপাঠমাত্র এখানে আসিবেন। অজার ঠাকুরমার অত্যন্ত অসুখ, বাঁচিবার আশা নাই। মরিবার আগে

আপনাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছে। আপনার সঙ্গে বড় দরকার। অনুগ্রহ করিয়া অবশ্য আসিবেন।" পত্র পড়িয়া ললিত বাবু বড় আশ্চর্য্য হইলেন—"আমার সঙ্গে আবার কি দরকার আছে?" অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গিয়া দেখেন বৃদ্ধা বিছানার সহিত মিশাইয়া শুইয়া আছে। শীর্ণ মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই ললিত বাবু চমকিয়া উঠিলেন। এমন ভয়ানক মূর্ত্তি তিনি কখনও দেখেন নাই। ধীরে ধীরে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমায় ডাকিয়াছেন, কি দরকার আছে বলুন।"

বৃদ্ধা। তোমার সঙ্গে কথা আছে সেই জন্য ডাকিয়াছি, আর কোন দরকার নাই। যদি শোন তবে বলি।

ললিত বাবু। বলুন আমি শুনচি।

বৃদ্ধা। অজা এখন কেমন আছে? বাবা আমি বড় পাপিষ্ঠা—আমার মত হতভাগিনী কে?

ললিত বাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? অজা ভাল আছে। আপনি বেশী কথা কহিবেন না।

বৃদ্ধা। বাবা বল্‌তে আমার বুক কেঁপে যাচ্চে। আমার কথা বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। আমি বল্‌তে পার্‌ছি না। বাবা—তোমায় বলি—আমার পাপের কাহিনী বলি—শোন বাবা শোন। অজা বেঁচে থাক্। অজা—আমার—আ—মা—র না—তি নয়।

ললিত বাবু। সে কি? সে কি? তবে তাকে কেমন করে পেলেন। বেশী কথা কবেন না।

বৃদ্ধা। বাবা এতদিন বলি নাই। আজ আর পারব না। আজ শেষের দিন। কেমন করে পেলাম; তবে বলি শোন। অজার মা একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে ৮ বছর আগে একখানা গাড়ী করে একদিন রাত্রে, এ রাস্তা দিয়া যাচ্ছিলেন। আমাকে তার একজন চাকর জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ গো বাছা! এখানে কোন ভদ্রলোকের বাড়ী আছে? একদিনের জন্য আমাদের স্থান দিতে পারে?" আমি হতভাগিনী বলিলাম "না—এখানে কারো বাড়ীতে জায়গা নাই। এমন করে আবার কে আসে?" আমার কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "না গো বাছা! আমার এখানে কেউ নাই। আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। এখানে আমার স্বামী জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, খবর পাইয়া আসিয়াছি। আমার থাকবার জায়গা নাই, সে বাড়ী খুঁজে পাচ্ছিনা। যদি থাক্‌তে দাও তবে আমায় বড় দয়া করা হয়। আমার কাছে টাকা কড়ি আছে, তোমার কিছু ক্ষতি করব না। বড় বিপদে পড়েছি, দয়া করে এক রাতের জন্য স্থান দাও।" আমি দেখিলাম ভদ্র-ঘরের মেয়ে বাস্তবিকই বিপদে পড়িয়াছেন। তাতে আবার টাকা কড়ি আছে শুনিয়া স্থান দিতে সম্মত হ'লাম। তারপর এ পাপিষ্ঠার পাপের কথা বলি শোন। স্ত্রীলোকটীর অত্যন্ত অসুখ হল। এই বিছানায়! হায়রে! সাধ্বী-সতী ৮ বছর আগে এ ছার সংসার ছেড়ে গেছেন। সেই বিছানায় আমি পাপিষ্ঠা আজ পাপের বোঝা মাথায় করে মরিতে বসিয়াছি।

বাবা আমি বড় পাষাণ। আমার প্রাণে দয়া মায়া নাই। আজ আমার সেই দিনকার কথা মনে পড়িতেছে। যখন অসুখে পড়ে তিনি ছেলেটীর মেয়েটীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল মুছিতেন, হায়রে পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে সেই মায়ের চোখের দুটী ফোটা জল দেখিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারে। আর আমি—আমি মহা পাতকী সে চোখের জলকে গ্রাহ্য করিতাম না। তাঁর চোখের উপরই আমি

ছেলেটীকে মেয়েটীকে মারতাম, খেতে দিতাম না, যত্ন করিতাম না। তাঁকে ত করিতামই না। শক্তি ছিল না যে একবার এদের কোলে করেন। আমায় কখন কিছু বলেন নাই। কেবল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁর চোখ দুটী যেন আমাকে বলিত, "আমার বাছাদের কষ্ট দিও না, এরা আমার মানিক, আমার সর্ব্বস্বধন!" ছেলেটী মেয়েটী খাট ধরে "মা" "মা" বলিয়া যেমন যেত তিনি জড়াইয়া ধরিয়া চুম খেতেন আর কাঁদিতেন, মেয়েটী বলিত "মা ওঠ! ওঠ! মা তোমার কি হয়েছে, মা বাড়ী যাবে না" তিনি কিছু বল্‌তেন না, কেবল কাঁদিতেন। এ সবে আমার মন গলিত না। আমি কি মানুষ! না মানুষের মন কি এত কঠিন হয়? আমি কখনই মানুষ নই। আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী! আমি রাক্ষসী!! বলি শোন—আমার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছে। এত অসুখ হয়েছিল, একদিন ডাক্তার ডাকি নাই। অসুধ দিই নাই। যত্ন করি নাই। আমি তার মৃত্যুর কারণ। আমার হাতেই তার প্রাণ গিয়াছে। উঃ! উঃ!! কি করেছি! তিনি আমায় বলিতেন "মা! এখানে ডাক্তার নাই?" আমি বলিতাম "ডাক্তার আবার তোমার জন্য ডাকে কে? অমনি সেরে যাবে।" তিনি আর উত্তর করিতেন না। এখানেই তার মৃত্যু হয়। আমিই তাঁকে মারিয়াছি। তাঁর যে কিছু টাকা কড়ি জিনিষ পত্র ছিল তা আমিই লই। অজা তখন ৬।৭ মাসের ছেলে। মেয়েটী প্রায় দুই বৎসরের। ছেলে মেয়ে দুটী দেখতে অতি সুন্দর ছিল। এদের মা দেখতে আরও সুন্দর ছিলেন। সে মুখখানি পানে চাহিলে লোকের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। মেয়েটীকে একজন নিলেন। কিন্তু কে জানে আমি ছেলেটীকে কেন দিলাম না। অজার কপালে কিনা এ সব ছিল। আমার মতন রাক্ষসীর ব্যবহার সহ্য করা তার কপালে ছিল। আমি আর বলিতে পারি না। বাবা—বাবা—আমার কি গতি হবে? আমার কি উদ্ধার আছে? বাবা—সকেত বল? আর সহ্য হয় না। আমি তাকে সারাদিনের মধ্যে জলমত দুধ দুই একবার খাওয়াইয়া দিতাম। খেতে দিলে খেত না। ভাল খাওয়া অভ্যাস ছিল কি না। ওকি খোঁড়া ছিল! ওকি অমন ছিল!! আমি করেছি। এ প্রাণ অমন কাজ কর্‌তে কেঁপে যেত না। এ হাত অত্যাচার কর্‌তে ভয় পেত না। এ প্রাণ পাষাণে বাঁধা। কোলে বসাইয়া রাখিতাম, কাঁদিলেই অত্যন্ত মারিতাম। মেরে মেরে না খেতে দিয়ে অমন দুর্দ্দশা করেছিলাম। ওগো সতি! তুমি কি তোমার প্রাণের ধনের দুর্দ্দশা দেখিতে? আমায় মাপ কর? করবে নাকি? ভগবান! তোমায় একদিনের জন্যও ডাকি নাই, আমার কি গতি করবে না? তুমি না করলে, ভগবান!—আর কোথা যাব। বাবা আর কথা কইতে পারি না। তুমি আমার কাছে ভগবানের নাম কর। আর ওই বই খানা অজার মায়ের। তিনি মরবার আগে বই খানা ওদের দিয়েছেন। তুমি ও খানা আমার অজাকে দিও। তাকে যদি একবার পাই, বুকে করে নিয়ে প্রাণ শীতল করি। তুমি ভগবানের নাম কর, ও নাম শুন্‌তে বড় ইচ্ছা কর্‌ছে।

ললিত বাবু সব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বই খানা নাড়িয়া দেখেন, তাতে লেখা আছে "প্রাণের অজিৎ, উর্ম্মিলাকে মায়ের ভালবাসার উপহার।"—কিরণমালা রায়।

ললিত বাবু তাঁর কাছে ভগবানের নাম করিয়া বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।
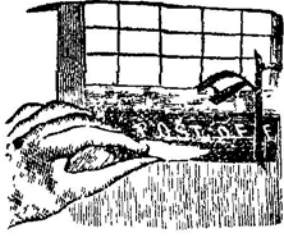
পত্র প্রেরকদের প্রতি।

শ্রীপ্রিযবন্ধু নিযোগী।—'সখা" পড়িয়া বালক দের উপকার হইতেছে, ইহ শুনিলে আমরা বড়ই সুখী হই। যাহারা উপকার পান, তাহারা যদি সেই কথা বলিয়া এক বয়সী আর দশ জনকে "সখা" পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আরও সুখী হই। এবৎসর যেমন রচনার পুরস্কার দেওয়া গেল, আগামী বৎসরে ও আমাদের এইরূপ পুরস্কার দিবার ইচ্ছা আছে।

ধাঁধা।

গত বারের প্রশ্নের উত্তর।

১। কচুরি। ২। ভারত।

নূতন।

১। বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে, হঠাৎ দেযাল থেকে একটা কি জন্তু তার মাথায় পড়িল, সে যেই হাত দিয়া ফেলিয়া দিতে গেল অম্নি উহার লেজটা তাহার মাথায় লাগিয়া গেল। বাঃ! বৈদ্যনাথ যে ভট্টাচার্য্য হয়ে গেল! বলত কি করে?

২। যখন আমার পেটের ভিতর থাক যাদুধন
শান্ত ছেলে হযে সবে ঘুমান্ত তখন।
বাইরে এসে মুখটি ঘসে কর মহা রোষ
আপনি জ্বলে সারা হও, আমার কি তা দোষ।

৩। আমাকে যদি কেউ পা দেয় তবে তার যন্ত্রণায় ছুটোছুটি করে প্রাণ যায়, আর যদি না দেয় তবে তখনি শুয়ে পড়ি; বলত আমি কোন্ জন্তু?

৪। ছোট বই বড় নই কে আমি বলত ভাই
থাকি আমি পণ্ডিতের ঘরে।
আমাতে নাইক যাহা কোথা নাহি পাবে তাহা
তাই সবে মোর সেবা করে।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে গড়ে দুইখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেবল রচনা পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

২নং বেনিয়াটোলা লেন পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

শ্রীঅন্নদাচরণ [illegible] প্রকাশিত।

দ্বিতীয ভাগ। নবেম্বর। ১১শ সংখ্যা।

একটী বালকের প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকান সহরের একটী বড দোকান। দোকানের কর্ত্তা রামকৃষ্ণ বাবু একজন খুব বড়লোক, তাই যখনই তাহার দোকানের দরজায় দেখা গেল যে তাহার চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একজন বালকের প্রযোজন, অমনি দলে দলে গরিবের ছেলেরা চাকরীর জন্য আসিতে লাগিল। যখনই কোন ছেলেকে চাকরী দেওযা হয়, অমনি বিজ্ঞাপনটা তুলিযা লওয়া হয। রাস্তা দিযা যত লোকজন যাতাযাত করে, তারা মনে করে, বুঝি লাহা কোম্পানীর লোক যুঠিযাছে—ওমা! এক দিন, দেড় দিন, কখনও দুদিন পরে আবার সেই বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে,—

"আমাদের দোকানের চিঠিপত্র বিলি করিবার জন্য একটী বালকের প্রয়োজন, ভিতরে অনুসন্ধান কর।"

লোকে বিজ্ঞাপন দেখিয়া বলাবলি করে "এদের কি রকম লোক চাই? এত দিনেও পাওয়া গেল না? তবে বুঝি একেবারে দেবতার মত লোক চায়—হুঁ—তা আর পেতে হয় না!" এদিকে রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব বুঝিয়া উঠা যায়না; কেবল চিঠি বিলি করিতে এমন কি বিদ্যাবুদ্ধি চাই, যে তাঁর লোক যোঠে না?—তবে বোধ হয় তার আরও কিছু কাজ করাইয়া লইবার ইচ্ছা আছে।

কেদারনাথ ঘোষ নামক একটী বালক লাহা কোম্পানীর এই মতলব সকলের আগে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাকে প্রথম দিন চাকরী দেওযা হইলে সে চিঠিপত্র বিলি করিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকাল বেলা, রামকৃষ্ণ বাবু ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ কেদার। তেতলার সিঁড়ীর নীচে আধার কামরাতে একটা খুব লম্বা বাক্স আছে, সেই বাক্সটার মধ্যের জিনিশগুলো গুছিযে রাখগেতো।" কেদার মনে মনে চটিল, কিন্তু কিছু না বলিযা আঁধার কামরাতে গেল। ঘরটী বাস্তবিক আঁধার নয, তবে কিছু আলো কম। কেদার গিয়া দেখে প্রকাণ্ড একটা লম্বা বাক্স, প্রায় দশ মণ বোঝা হবে, আর তার মধ্যে ভাঙ্গা প্রেক, মর্চ্চেধরা স্ক্রু, বড় বড় গজাল, এই সব রহিয়াছে। কেদার দুই একবার নাড়িতে চাড়িতে তাহার ভিতর হইতে একটা ইন্দুরের বাচ্ছা বাহির হইয়া পড়িল। "ই—মা গো! আমার কর্ম্ম নয়"—বলিয়াই কেদার তিন লাফে সিঁড়ী পার হইয়া নীচে আফীশ-ঘরে গিয়া বসিয়া শিশ্ দিতে

লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে রামকৃষ্ণ বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে! এর মধ্যেই হয়ে গেল।" কেদার বলিল "কিছু করবার নাই—সব ভাঙ্গা মর্চ্চেধরা জিনিশ। আর ওসব করবার জন্যেতো আমায় রাখা হয়নি।" রামকৃষ্ণ বাবু হাসিয়া বলিলেন—"ও: আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে যা ব'লব তাই ক'রবে। তা যাক্! এই চিঠিগুলো ডাকে দিয়ে এসো।"—কেদার চিঠি লইয়া ডাকে দিতে গেল। যাইতে যাইতে ভাবিল "উচিত কথায় সকলেই জব্দ; বুড়োটাকে দুটো উচিত কথা বলেছি, আর অমনি সোজা, হি! হি! এমন না করলে কি আর কাজ চলে?" সেই দিন বিকাল বেলা আফীশ বন্ধ করিয়া বাহির হইবার সময় রামকৃষ্ণ বাবু কেদারের মাহিয়ানা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন—"কাল থেকে তুমি আর এসোনা।" কেদার অবাক্! কিছু বলিতেও পারিল না, কারণ রামকৃষ্ণ বাবু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। পর দিন প্রাতে দোকানের দরজায় আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিল—"বালকের প্রয়োজন।"

আর একটী বালক আসিল, তাহার নাম দীননাথ দাস। সেও প্রথম দুই দিন বেশ চিঠিপত্র বিলি করিল; তিন দিনের দিন রামকৃষ্ণ বাবু তাহাকে আঁধার ঘরে বাক্স গোছাইতে পাঠাইলেন। বালক খানিকক্ষণ বসিয়া গোটাকতক পরিষ্কার প্রেক, স্ক্রু, প্রভৃতি লইয়া নীচে আসিল এবং রামকৃষ্ণ বাবুকে বলিল—"মহাশয় এই কটা ভাল জিনিশ পাওয়া গেল—আর সব নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো কি গোছাব?"—রামকৃষ্ণ বাবু বলিলেন, "সেই গুলোইতো গোছাতে বলেছিলাম।" সেই দিন সন্ধ্যা বেলা দীননাথের চাকরী গেল। দীননাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল "আমার দোষ কি?" বাবু কিছুই উত্তর করিলেন না। তাইতো! পাঠক পাঠিকা হয়তো মনে করিতেছেন "এ কি রকম মজার লোক রে বাপু!" যাহা হউক, পর দিন প্রাতে রাস্তার লোক দেখিল আবার বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে।

এইবারে আর একটী বালকের কপাল খুলিল, ইহার নাম যদুপতি ভট্টাচার্য্য। যদুপতি আগের দুটী বালককেও চিনিত না এবং আঁধার ঘরের বাক্সের কথাও জানিত না। সে আসিয়া একদিন বেশ কাজ করিল। পরদিন প্রাতে তাহাকে আঁধার ঘরে পাঠান হইল। যদুপতি সেখানে গিয়াই জিনিশগুলি গোছাইতে আরম্ভ করিল। যে জিনিশটা একটু পরিষ্কার করিলেই নুতনের মত হয়, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া এক এক রকম জিনিশ এক সঙ্গে রাখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কিন্তু সমস্ত জিনিশ আর পরিষ্কার হয় না, এত কাজ! নীচে থেকে বাবু ডাকিলেন—"যদু! হয়েছে?"—বালক বলিল, "আজ্ঞে, এখনও অনেক বাকী।" বাবু বলিলেন—"আচ্ছা! তবে এখন থাক্, খাওয়া দাওয়া ক'রে এসে আবার কর্‌বে এখন।" যদুপতি তাহাই করিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বাবু যদুপতিকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময় বালক নীচে গেল,—তাহার মাথা দিয়া দর্ দর্ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। বাবু বলিলেন—"কিহে! হ'ল?" বালক মাথা হেঁট করিয়া উত্তর করিল "আজ্ঞে, যতদূর পারি করেছি! আর বাক্সটার সব নীচে এইটা পেয়েছি, নিন।" রামকৃষ্ণ বাবু দেখিলেন একখান মোহর,—বলিলেন, "জঞ্জালের বাক্সই সোনা রাখবার যায়গা বটে! আচ্ছা, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে, আবার কাল এসো।" বালক চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণ বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া উপরে গেলেন। সে আঁধার ঘরে প্রায় কেহই যায় না—ঘরের মধ্যে মাকড়শার জাল, আরশুলার পাল, আর ইন্দুরের দল। মধ্যের বাক্সে পঁচিশ বছরের জঞ্জাল জমিয়া রহিয়াছে।

বামকৃষ্ণ বাবু গিয়া দেখিলেন, বালক বাক্সের সমস্ত জিনিশ বাহির করিয়া, টিনের পাত দিয়া বাক্সে ঘর করিয়াছে; এবং এক এক ঘরে এক এক রকম জিনিশ রাখিয়া তাহার গায়ে লিখিয়া দিয়াছে—"ভালস্কু," "ছবি রাখবার গজাল," "চাবিকাটি," "ছোট প্রেক—একটু বাঁকা," "চেপ্‌টা লোহা, কি করে জানিনা," "মর্চ্চেধরা স্কু," "বঁটির মত কি যেন," ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ বাবু দেখিয়া আনন্দে হো! হো! করিয়া হাসিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"এই ছেলেই চাই। যে এই সব সামান্য বিষয়েই এতো মনোযোগী, সে তো বড় বিষয়ে আরও মনোযোগী হবেই।"

রামকৃষ্ণ বাবুর দোকানে আর বিজ্ঞাপন ঝুলিল না। যদুপতি ভট্টাচার্য্য রামকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর দোকানে চিঠি বিলি করিবার কাজে নিযুক্ত হইল, কিন্তু তাহাকে বেশী দিন এ কাজ করিতে হয় নাই। রামকৃষ্ণ বাবুর মতলব এতদিনে বোঝা গেল, তিনি চিঠি বিলি করিবার জন্য লোক চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু চিরকাল তাহাকে দিয়া চিঠি বিলি করাইতে চাহেন নাই। যদুপতি ভট্টাচার্য্য কালে দোকানের একজন প্রধান বাবু হইল, এবং রামকৃষ্ণ বাবু মরিয়া গেলে, দোকানের একজন কর্ত্তা হইয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। রামকৃষ্ণ বাবু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, যদুপতিকে পুত্রের ন্যায় ভাল বাসিতেন এবং লোকে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "এ লোকটা কোথা থেকে এসে আপনার ভালবাসা পেয়ে ব'সলো," তখন তিনি হাসিয়া উত্তর করিতেন—"আঁধার ঘরের জঞ্জালের বাক্স থেকে!"

বাস্তবিকই যে সামান্য কাজে মনোযোগী, তাকে বড় কাজে দিয়া বিশ্বাস করা যায়। আর যে সামান্য কাজ সামান্যভাবে করে, তার কপালে কি আছে, সে কথা যারা ভুগিতেছে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিও।

একটা কিছু।

বহুবাজারের চৌরাস্তার ধারে অনেক দিন হইল একদিন একটী বালক দাঁড়াইয়া "চাই দেশলাই, পয়সায় দুটো দেশলাই"—বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। ছেলেটীর মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন সে কাহাকেও ঠকাইতে জানে না। বালকটী প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া দেশলাই বিক্রী করিল এবং কাজ শেষ হইলে আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে বাড়ী চলিল।

কলিকাতার একটা বিশ্রী গলিতে গোষ্ঠবিহারীর বাড়ী। বালক বাড়ী যাইবার সময় পথ হইতে কিছু খাবার কিনিয়া লইল, এবং তাহা খুব সাবধানে কাপড়ে বাঁধিয়া, কত পয়সা লাভ হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু এ ভাবনায় ওই দেখ উহার মুখে আহ্লাদের হাসি দেখা যাইতেছে, "এই পয়সা দিয়ে একটা কিছু ক'রব"—বালক মনে মনে ইহাই ভাবিতেছে আর আপনার মনে হাসিয়া খুন হইতেছে।

পচা নর্দ্দমার উপরে কাঠ ফেলা, তাহার উপর দিয়া যাইতে ভয় করে, পাছে টিপ্ করে পড়িয়া যাই, কিন্তু বালক গোষ্ঠ অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং খানিক চলিয়া একখানি ছোট খোলার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইল। তখন সে আস্তে আস্তে দরজাটী খুলিয়া সেই ভাঙ্গা ঘরে ঢুকিয়া গেল এবং দেশলাই ঘসিয়া একটা আলো জ্বালিল। বালকের পায়ের শব্দ শুনিয়া ঘরের মধ্য হইতে একটী বালিকা বলিয়া উঠিল—"কে, দাদা এলে? দেখ দাদা! আজ আমি সূয্যি একটু দেখেছি, সেই সাদাপানা দেখ্‌তে, না?" বালিকার নাম লক্ষ্মীমণি, সে অন্ধ, আজ সূর্য্য

দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া তাহার বড় আনন্দ, কিন্তু দাদা বই তারতো আর কেউ নাই, কাহাকে এ সুখের খবর দিবে? তাই দাদা আসিবামাত্র তাঁহাকে খবর দিল। গোষ্ঠ মহা আনন্দিত হইয়া বলিল—"বটে? বটে? এই আর বেশী দিন নয়—আর ৭ দিন দেশলাই বিক্রী কর্‌তে পার্‌লেই আমার সবশুদ্ধ ৪ টাকা হবে, তা হলেই তোমাকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে নতুন চোখ্ বসিয়ে এনে দেব।" এই কথা বলিতে বলিতে বালক ভগিনীর নিকটে ছুটিয়া গেল এবং তাহার মুখে চুমো খাইয়া বলিল, "এসো, খাবে এসো।" অন্ধ বোন, চলিতে পারে না,—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা ভাঙ্গা আসনে বসাইল এবং খানিকটা গরম দুধ ও খাবার তাহাকে খাইতে দিল। বালিকা দুধ খাইতে খাইতে বলিল "দাদা! এ যে বেশ মিষ্টি দুধ, তুমিও খাবে?" গোষ্ঠ বলিল "দূর পাগ্লী! পুরুষ ছেলের আবার দুধ কি খাবে, পুরুষ ছেলেরা জল খেয়েই বড় হয়।" ইহার পর গোষ্ঠও নিজে কিছু খাইল, পরে দুভাইবোনে পাশাপাশি শুইয়া নিদ্রা গেল।

ইহার পর আর ৭ দিন চলিয়া গেলে আট দিনের দিন প্রাতঃকালে গোষ্ঠবিহারী লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া সেই পচাগলি হইতে বড় রাস্তায় বাহির হইল। চোখের ডাক্তার ভাল কে? তিনি কোথায় থাকেন? কত টাকা দিতে হয়? এসব খবর বালক আগেই জানিয়া রাখিয়াছিল। আজ বড় রাস্তায় বাহির হইয়াই বালক এক হাতে বহু কষ্টের ধন চারিটী টাকা মুটো করিয়া এবং আর এক হাতে অনেক ভালবাসার ধন আপনার অন্ধ ভগিনীকে ধরিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে গেল।

বড় ডাক্তারের বড় কারখানা, সদর দরজার কাছে একটা ঘরে একখানা দড়ির খাটিয়ায় বসিয়া ফোঁটা-কাটা, পেট-মোটা একটা দরওয়ান 'কাহেকো রামুয়ারে' বলিয়া কি যেন পড়িতেছিল। বালক-বালিকাকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়াই আমাদের দরওয়ানজী আরও চেঁচাইয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন। গোষ্ঠ একটু নিকটে গিয়া ডাক্তার বাবু আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিল। দ্বাররান বলিল—"কোন হ্যায় রে!" গোষ্ঠ আবার বলিল "ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আছেন?" তখন দ্বাররান মহাশয় দাড়ী চুমরাইয়া চেকুর তুলিয়া, বলিলেন—"তুহার লোকের জন্যে ডাংতার কাঁহা মিল্‌বে রে? টাকা চাই। ভাগ্, ভাগ্।" বেচারা লক্ষ্মীমণি বিপদ বুঝিয়া দাদার হাত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিল। গোষ্ঠ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলিল "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এই দেখ, বেচারী লক্ষ্মী দুটী চোখে দেখ্‌তে পায় না।" লক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া দ্বাররানের একটু দয়া হইল, সে তখন রযের পাতা মুড়িয়া "বহো, হামি দেখে" বলিয়া ডাক্তার বাবুকে খবর দিতে গেল।

গোষ্ঠ এবং তাহার ভগিনীকে অনেকক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। খানিকক্ষণ পরেই দ্বাররান আসিয়া তাহাদিগকে একটা ঘরে লইয়া গেল, একটু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। বালক ভগিনীর সমস্ত কথা বলিয়া বলিল "বাবু! আপনি একে দুটো নতুন চোখ্ বসিয়ে দিন্।" ডাক্তার বাবু গোষ্ঠের কেউ নাই শুনিয়া এবং কেমন করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খুব যত্ন করিয়া লক্ষ্মীর চোখ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে তাহার মুখে হাসি দেখা গেল—বলিলেন "কোন ভয় নাই। একে সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়া থাকিতে হবে। ব্যারাম কিছু শক্ত নয়, বোধ হয় এক মাসেই ভাল হবে।" গোষ্ঠ বলিল—"আমি সেখানে যেতে পাব?" ডাক্তার বাবু বলিতেছিলেন—"তাও কি হয়?" কিন্তু লক্ষ্মী যে ভাবে ভাইকে ধরিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বলিলেন—"দেখ্‌ব, যেতে

পাব কিনা।" তখন গোষ্ঠ টাকাগুলি খুলিয়া ডাক্তার বাবুকে দিতে গেল, কিন্তু তিনি নিলেন না, বলিলেন "রেখে দাও, লক্ষ্মীকে ভাল ভাল খাবার, খেলনা, কি আর কিছু কিনে দিও। ভাল ছবিও দিতে পার, কিছুদিন পরে দরকার হবে।"

এক মাস পরে একদিন গোষ্ঠ লক্ষ্মীমণির হাত ধরিয়া ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইল। এ লক্ষ্মী যেন সে লক্ষ্মী নয়, চমৎকার চক্ষু ফুটিয়াছে, চারিদিকে বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, গাছপালা দেখিয়া বালিকা আনন্দে নাচিতে নাচিতে চলিল। বাড়ীর কাছে পৌছিয়া বিকাল বেলা আকাশের সুন্দর বর্ণ দেখিয়া বালিকা বলিল—"দাদা। দেখ, দেখ, কি সুন্দর।"—গোষ্ঠ লক্ষ্মীর চক্ষুতে চুমো খাইয়া বলিল—"আমার কাছে সব চাইতে এই চোখ দুটীই ভাল।"—বালক সেই যে সে দিন টাকা রোজগার করিয়া 'একটা কিছু' করিবে ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহার সেই "একটা কিছু' করা হইল,—তাহার ভগিনীর সুন্দর চক্ষু ফুটিল। বাড়ীতে আসিয়া লক্ষ্মীমণি দেখে দাদা তাহার জন্য নানারূপ খেলনা, ভাল ভাল ছবি, কিছু ভাল খাবার এই সব যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। তখন তাহার আহ্লাদ দেখে কে!

কিন্তু একজন ভদ্রলোক এ পচা বাড়ীতে তাহাদিগকে অধিক দিন থাকিতে দিলেন না। ডাক্তার বাবু বালক বালিকাকে নিজের বাড়ীর কাছে আনাইয়া সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবু ও তাহার স্ত্রীর দয়ায় দুই ভাই ভগিনী সৎপথে থাকিয়া মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

হাইকোর্ট।

যদি যাহারা দোষী তাহারা শাস্তি না পায়, তাহা হইলে দেশে যে কত পাপ বাড়ে, তাহার কি শেষ আছে? যাহাতে বলবান লোক দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে এবং দোষী লোক নির্দ্দোষী লোককে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে বাধা দিতে না পারে, যদি তাহা দেখিবার লোক না থাকিত, তাহা হইলে কি কোন দেশে মানুষ থাকিতে পারিত? এই জন্যই সকল সভ্য দেশে রাজা আছে, কর্ত্তা আছে, আইন আছে, এবং বিচারক বা জজ আছে। তবে এক দেশে এবং আর এক দেশে তফাৎ এই যে, এক দেশে হয়ত রাজা যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই আইন হয়, এবং তাহাই সকলকে মানিয়া চলিতে হয়, আর এক দেশে হয়ত দশে মিলিয়া নিজেদের সুবিধার জন্য একটা সভা করিয়া, সেই সভাতে যাহা স্থির করেন তাহাই আইন হয়; আবার কোথাও বা রাজার অধীনে তাহার মন্ত্রীরা বা তাহার প্রতিনিধিরা রাজার হুকুম লইয়া সাধারণ লোকের সুবিধা হইবে মনে করিয়া যাহা করেন তাহাই আইন হয়। আইন যেরূপই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য সকলের মঙ্গল করা। কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায়, যে একটা আইনে উপকার না হইয়া অপকার হইতেছে; তখন বুদ্ধিমান মন্ত্রীরা বা রাজার লোকেরা সে আইন বদলাইয়া অন্য আইন করেন, কিন্তু যতদিন একটা আইন 'চলতি' থাকে, ততদিন সকলকে সেই আইন মান্য করিয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে কি মানুষ
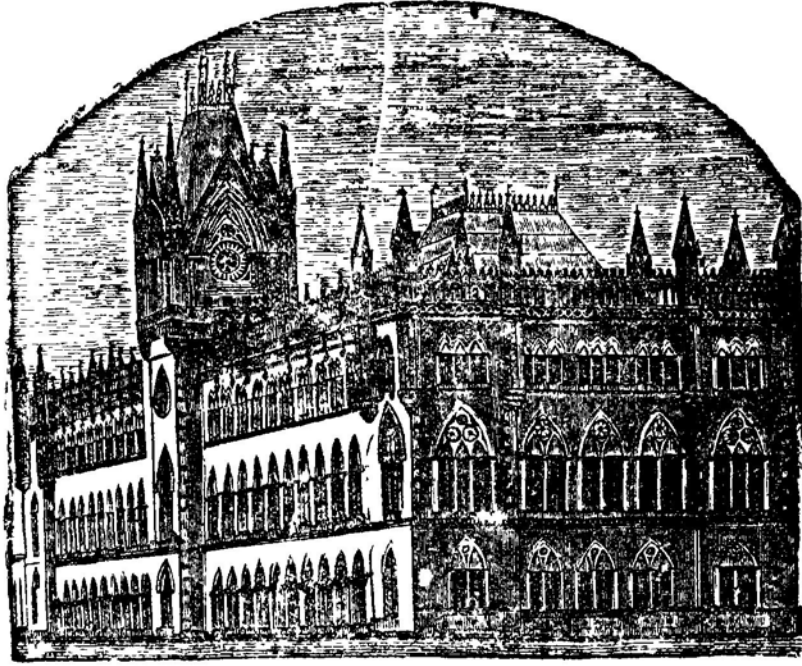
এক সঙ্গে চলিতে পারে? যে যাহা খুসী করিবে, অথচ সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে, ইহা কখনও হয় না। আইন দুষ্ট লোক, অত্যাচারী লোক প্রভৃতিকে যেন বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আইন বলিতেছে এই কাজ খারাপ, যে করিবে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে, যাঁহার জিনিশ তাঁহাকেই দিতে হইবে, নির্দ্দোষীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, এবং অত্যাচারীকে দমন করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু আইন থাকিলে তো হয় না, কে অন্যায় কাজ করিতেছে, কে আইন ভাঙ্গিতেছে, তাহা দেখেই বা কে আর তাহার বিচারই বা কে করে? ইহার জন্য সকল দেশেই পুলীশ বা শান্তিরক্ষক আছে, মাজিষ্ট্রেট বা শাসনকর্ত্তা আছে, জজ বা বিচারপতি আছে, এবং আদালত বা বিচারের স্থান আছে। তুমি ডাকাতী করিয়াছ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, পুলীশ শুনিতে পাইয়াই তোমাকে ধরিল, ধরিয়া তোমার ডাকাতী করার কি কি প্রমাণ আছে, তাহার সহিত তোমাকে মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইল। সেখানে মাজিষ্ট্রেট বিচার করিয়া তোমাকে জজের নিকট পাঠাইলেন, এদিকে তুমি বুঝিতেছ তুমি নির্দ্দোষী, কিন্তু জজ ওদিকে ঠিক করিয়া বসিলেন, তুমি ভয়ানক দোষী, কেবল লুঠপাট করিয়াছ, তাহা নহে, অনেক মানুষও মারিয়াছ। জজ বলিলেন "তোমাকে চিরকালের মত দেশ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সমুদ্রের মধ্যে একটা বুনো দ্বীপে, (আণ্ডামান দ্বীপে) স্ত্রীপুত্র, মা বাপ, ভাই বোন ছাড়িয়া তোমাকে কয়েদী হইয়া থাকিতে হইবে।" তুমি দেখিলে তোমার প্রতি অবিচার হইল, তুমি জজের অপেক্ষা বড় যাঁহাদের আদালত, তাঁহাদের নিকট 'আবার বিচার হউক,' এই প্রার্থনা করিলে। এই সর্ব্বাপেক্ষা বড় আদালতের নাম **হাইকোর্ট।**

পুনর্ব্বার বিচার করিবার প্রার্থনাকে ইংরাজীতে আপীল (Appeal) বলে। সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সব চেয়ে উচ্চ আদালত হাইকোর্ট। নীচে অন্যান্য আদালতে অবিচার হইয়াছে মনে হইলে লোকে হাইকোর্টে আপীল করে। হাই-কোর্টের বিচারপতিরা প্রায়ই বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিয়া মত দেন না। তাহাদের বিচারের উপরে আর কাহারও কথা চলে না, তবে ইচ্ছা করিলে বিলাতের প্রিভি কৌন্সিল নামক সভা এবং আমাদের দেশের গবর্ণর জেনেরল অর্থাৎ বড়লাট বাহাদুর হাইকোর্টের বিচারও উল্টাইয়া দিতে পারেন।

আমরা হাইকোর্টের একটা ছবি দিলাম। হাইকোর্ট হইবার পূর্ব্বে মুসলমানী ধরণের দুটী আদালত ছিল,—সেই দুটী মিশিয়াই বর্ত্তমান হাইকোর্ট হইয়াছে।

হাইকোর্টে অনেকদিন হইতে একজন করিয়া বাঙ্গালী জজ আছেন। এই সকল বাঙ্গালী মহাত্মাদিগের মধ্যে মৃত দ্বারকানাথ মিত্র এবং বর্ত্তমান জজ রমেশচন্দ্র মিত্রই বিশেষ বিখ্যাত। দুজনেই সুপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং ঘোর সাহসী। মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথের গল্প শুনিয়াছি যে একবার একটা বিচারে ১২ জন জজ এক সঙ্গে বসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি একলা বাঙ্গালী আর সব সাহেব। মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষ দোষী কোন্ পক্ষ নির্দ্দোষী এই কথা লইয়া তাঁহার সহিত এগার জন সাহেব জজের মতের অমিল হয়। দ্বারকানাথ তাহাতে ভয় না পাইয়া এমনি বুদ্ধির সহিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, যে শেষকালে সাহেবেরা তাঁহার মতে মত দিলেন। গল্পটা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না; তবে এটা নিশ্চিত যে তিনি সিংহের ন্যায় সাহসী ছিলেন, কাহারও চোখ রাঙ্গানিতে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। আর আমাদের বর্ত্তমান জজ মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও খুব সাহসী, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কোন বিষয় লইয়া গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের মত চান, তাহাতে অধিকাংশ সাহেব জজ এক দিকে এবং রমেশ বাবু একলা অন্য দিকে মত দিলেন।

হাইকোর্টের জজ দুই প্রকার, এক যাঁহারা বিলাতে মাজিষ্ট্রেটী (Civil Service) পরীক্ষায় পাশ হইয়া আসিয়া পরে জজ হন, আর ব্যারিষ্টার অর্থাৎ কৌন্সলী বা উকীলদের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক বাছিয়া যাঁহাদিগকে জজিয়তি দেওয়া হয়। আমাদের রমেশ বাবু উকীল জজ। মাজিষ্ট্রেটী বা সিবিল জজ এবং ব্যারিষ্টার বা কৌন্সলী জজ বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ নাই। তবে এর পরে কেহ কেহ হইতে পারেন।

সম্প্রতি শুনিতেছি, হাইকোর্টে আরও কয়েক জন নূতন জজ হইবেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বাঙ্গালী থাকিবেন কিনা বলিতে পারি না।

হাইকোর্টের জজ হওয়া খুব গৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এ গৌরব কি কেবল টাকাতে হয়? কখনই না। দেশের কত হাজার হাজার লোক ন্যায় বিচার পাইবে বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে, নির্দ্দোষীকে মুক্তি দিতে হইবে এবং দোষীকে শাস্তি দিয়া দেশের মধ্য হইতে পাপের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতে হইবে,—আমার দ্বারা এই কার্য্যের সাহায্য হইবে, ইহাতেই আমার জজিয়তির গৌরব, নতুবা আর কিসে?

শেষকালে একটা কথা বলি। আমরা হাই-কোর্টের সিংহাসনে জজ হইয়া বসি আর নাই বসি, আমরা সকলেই যে বিচারক এবং সকলেই যে বিচারিত হইতেছি, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে। যেমন আমরা দোষ করিলে বাপ মা শাস্তি দেন বা দাদা বিচার করেন, তেমনি পুঁটী বা ভোঁদা বা কেবলা বা অন্য কোন ছোট ভাই

কোন দোষ করিলে আমরাই বিচার করি। তখন যেন মনে থাকে যে যার যতটুকু দোষ তার ততটুকু শাস্তি হওয়া উচিত, নির্দ্দোষী যেন শাস্তি না পায় এবং অল্পদোষে যেন বেশী শাস্তি না হয়। মনে রাখিও, একজন বড়লোক বলিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি ন্যায়কে রাজত্ব ক'রতে দাও"

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

নবম অধ্যায়।

বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াই ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ইটের চকে আসিবার জন্য একখানা পোষ্টকার্ড লিখিলেন। রাজকুমার বাবু পত্র পাইবা মাত্র ইটের চকে রওনা হইলেন, এবং তথায় পৌঁছিয়া ললিত বাবুর নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক হইলেন। সকল কথা শুনিয়া রাজকুমার বাবুর তাঁহার ছোট বোনের একটী গল্প মনে আসিল। তিনি ললিত বাবুকে বলিতে লাগিলেন—"আজ প্রায় অনেক দিন হইল আমার ছোট বোনের একজন উৎসাহী, সাহসী, ধাৰ্ম্মিক যুবা পুরুষের সহিত বিবাহ হয়। বাবা তার আর আমার বোনের উপর কি কথায় অত্যন্ত রাগিয়া তাঁহাদিগকে সেই দিনই বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমার ভগ্নীপতির নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। শ্রীশ বাবু সেই দিনই আমার বোনকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন আমার বোনের বয়স ১৭ বৎসর। তাদের অল্প দিনই বিয়ে হয়েছিল। বাবাও জীবনে আর নাম করেন নাই—বাবার কি বিষম রাগ ছিল!—আমরাও আর তাঁদের বিশেষ কোন খবর পাই নাই।"

ললিত বাবু। আপনার বোনের নাম কি

রাজকুমার বাবু। কিরণমালা।

ললিত বাবু। ও। ও! অজার ঠাকুর মা অজাকে যে বইখানা দিয়াছেন সেই বইখানা অজার মা অজাকে আর অজার বোনকে দিয়া গিয়াছেন। অজার মার নামও কিরণমালা রায়। আপনার বোন ত নন?

রাজকুমার বাবু। আচ্ছা বইখানা নিয়ে আসুন ত দেখি, সে খানা দেখলে আমি টের পাব কিরণের বই কিনা?

ললিত বাবু বইখানা আনিয়া রাজকুমার বাবুর হাতে দিলেন। বইখানা দেখিয়াই রাজকুমার বাবু বলিয়া উঠিলেন "দেখি! দেখি! এ খানা যে আমার বাবার বই।" বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইয়া এক যায়গায় দেখিলেন যে তাঁর বাবার নাম লেখা রয়েছে। নামটী পড়িয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"ও! তবে কি সত্য সত্যই অজিৎ আমার ভাগনে! কিরণ! দিদিটী আমার! বাবার জন্য তুমি কি না কষ্ট পেয়েছিলে? ভগবান! তোমার যে কি বিচিত্র লীলা! এ মিলনে তোমারই হাত! তুমিই আমাদের মিলাইয়া দিলে!! আজ আমার কি শুভদিন!!" কিছুক্ষণ পরে তিনি ললিতবাবুকে বলিলেন "চলুন আমরা সেই বুড়ীর কাছে যাই। আজ যদি আবার ঊর্ম্মিলার কোন খোঁজ পাই। তাকেও খুঁজে বের করতে হবে।"

পরে ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু দুজনে বুড়ীকে দেখিতে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন বাড়ীর দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর কে এক জন বলিয়া উঠিল "কে গা! কাকে চাও?"

ললিত বাবু। দরজাটা একবার খুলে দাও ত বাছা?

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া ললিত বাবু চিনিতে পারিলেন।

স্ত্রীলোকটী অজার ঠাকুরমার ঘরের পাশে থাকে। ললিত বাবু তাহাকে বলিলেন "হ্যাঁ গা বাছা! অজার ঠাকুরমা আজ কেমন আছেন?"

স্ত্রীলোক।—যদি আপনাদের দেখবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে একটু আগে এলে দেখতে পেতেন। এই দু ঘণ্টা হ'ল মরে গেছে। তাকে এখন ঘাটে নিয়ে গেছে।

ললিত বাবু। ওমা, এত শীঘ্র মারা যাবেন, তাত আমি বুঝিতে পারি নাই। আহা! হা! বড় মাটি করলাম। রাজকুমার বাবু! কি করা যায় বলুন ত? (তার পর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন) হ্যাগা বাছা! তুমি কি অনেক দিন হতে এই মেয়ে মানুষটীকে দেখিতেছ?

স্ত্রীলোক। হ্যাঁ! অনেক দিন থেকে দেখছি। আমি এখানে যতদিন এসেছি ততদিনই দেখিতেছি।

ললিত বাবু। তুমি অজার মাকে বোধ হয় দেখিয়াছ?

স্ত্রীলোক। হ্যাঁ! আজ প্রায় দশ বৎসর হইল একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে একটী ছেলে একটী মেয়ে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এসেই ভয়ানক রোগে পড়িলেন। কিছু দিন পরে ছেলে মেয়ে দুটীকে ফেলে মরে গেলেন। তার পর অজার ঠাকুর মা মেয়েটীকে নবকুমার বসুর স্ত্রীকে দিল, ছেলেটী তার নিজের কাছেই রহিল। ছেলেটীকে অনেক কষ্ট দিত—খেতে দিত না, মারিত। এত কষ্ট দিত যে দেখলে মানুষ না কেঁদে থাকিতে পারিত না।

ললিত বাবু। আর থাক্, মৃতের নিন্দায় কাজ নাই। তুমি ছেলেটীকে যত্ন করিতে না? আর অজা কি ছেলে বেলা থেকেই খোঁড়া ছিল।

স্ত্রীলোক। না। খোঁড়া ছিল না। দেখতে দিব্বি ছিল। আমি তাকে কি আর যত্ন কর্‌ব। আমার নিজের কত কাজ ছিল। আমি গরিব মানুষ, কত কাজ। যত্ন কর্‌বার সময় কোথায় ছিল?

ললিত বাবু। নবকুমার বাবুরা কোথায় থাকেন, বলিতে পার কি?

স্ত্রীলোক। শুনেছিলাম বড় বাজারে থাকেন।

ললিত বাবু রাজকুমার বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন "চলুন একবার বড় বাজারে যাই, মেয়েটীকে খুঁজে বের কর্‌তে হ'বে।"

তখন ললিত বাবু ও রাজকুমার বাবু বড় বাজারে নবকুমার বাবুদের উদ্দেশে চলিলেন।

সেখানে অনেক খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "নবকুমার বসুর বাড়ী কোনটা?" সে লোকটী বলিল "হ্যাঁ। নবকুমার বসু এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু এখন আর এখানে নাই। নবকুমার বসুর মৃত্যু হওয়ার পর তার স্ত্রী আর একটী মেয়ে কিছুদিন এখানকার একটা বাড়ীতে ছিলেন। তারপর একদিন নবকুমার বাবুর স্ত্রীর ছাত থেকে পড়ে একটা দুর্ঘটনা হওয়াতে, এখানকার হাসপাতালে তাকে লইয়া যায়। তিনি গেলে মেয়েটী কিছুদিন বাড়ীতে একলা ছিল। কিন্তু নবকুমার বাবুর স্ত্রী আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাঁর কি হয়েছে জানিনা। তার পর কিছু দিন পরে বাড়ীওয়ালা মেয়েটীকে বাড়ী থেকে তাড়াইয়া দিল। ঘরের জিনিষ পত্র বেচিয়া লইল। তার পর মেয়েটীর যে কি দশা হয়েছে তা আমি বলিতে পারি না।"

রাজকুমার বাবু। মহাশয়! মেয়েটীর নাম কি ছিল, বলিতে পারেন?

ভদ্রলোক। ঊর্মিলা না কি ছিল আমার ঠিক মনে নাই।

এই কথা শুনিয়া দুজনেই নিরাশ হইলেন। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুকে বলিলেন "সেই হাসপাতালে গিয়া নবকুমার বাবুর স্ত্রীর খোঁজ করিতে হবে। আজ তবে বাড়ী ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা দুজনে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। রাজকুমার বাবু সেই দিনই বাড়ী চলিয়া গেলেন।

এব্রাহাম লিঙ্কন্।

A. Lincoln

আমেরিকা-দেশে এক সময় দাস-প্রথার জ্বালায় কালো মানুষের বাঁচা ভার হইয়া উঠিয়াছিল। "দাস-প্রথা" বা দাস-ব্যবসায়টা কি জিনিষ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ না? আগে তাহার কথা একটু বলি শুন। এই যে ইংরাজদের আজ কাল দেখিতে পাও, ইঁহারা যে কেবল আজ কালই কালো মানুষের উপর 'জোর জুলুম' আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেক কাল আগে ইঁহাদের মনে মনে একটা স্থির বিশ্বাসই ছিল যে সাদা মানুষের চাকর—গোলাম—হইয়া থাকিবার জন্যই পরমেশ্বর কালো মানুষদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া, ইঁহারা আফ্রিকা দেশে গিয়া নানা ছলে, ছলে না পারিলে গায়ের বলে, কালো কাফ্রীদিগকে ধরিয়া আনিতেন, তাহাতে ছোট কচি ছেলে, অথবা অতি অতি বুড়ো, কেহই বাদ যাইত না। দেশে আনিয়া সাদা মহাশয়েরা কালোগুলোকে নিলামে বিক্রী করিতেন। যেমন গরু ছাগল বিক্রী করিতে লইয়া গেলে কিনিবার সময়, যাহারা খরিদদার, তাহারা বেশ করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট মোটা সোটা দেখিয়া বাছিয়া লয়, এই হতভাগা কাফ্রীদের বিক্রী করিবার সময় ঠিক সেইরূপ কাণ্ড হইত। কোন স্থানে বুড়ো বাপ তাহার যুবা ছেলেকে সঙ্গে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, খরিদদার বুড়োর আশার ধন ছেলেটীকে কিনিয়া লইয়া গেল, বুড়োর যে কি দশা হইবে, তাহা চাহিয়াও দেখিল না। তোমার মা বুড়ো হইয়াছেন, তাঁহার কাছ থেকে তোমাকে ছিনাইয়া যদি কেহ লইয়া যায়, তাহা হইলে তোমার এবং তোমার মার কি কষ্ট হয় বল দেখি? *তখন কি ইচ্ছা করে না, যে যদি সুবিধা* হয় তাহা হইলে সেই পাষণ্ড ডাকাতের মাথাটা কেটে দুখণ্ড করে ফেলি? কিন্তু আমেরিকাতে প্রতিদিন নিলাম ঘরে এইরূপ মানুষ বিক্রী হইত, যুবা পুত্রকে বুড়ো বাপের কাছ থেকে, ছোট ছেলেকে প্রিয় মায়ের কোল থেকে, ভগিনীকে ভাইয়ের পাশ থেকে, প্রতিদিনই নিষ্ঠুর সাদা লোকেরা কাড়িয়া লইয়া যাইত, সমস্ত দিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া আপনাদের ক্ষেতে গরু ঘোড়ার মত কাজ করাইয়া লইত, এবং মনের মত কাজ করা না হইলে চাবুক মারিয়া রক্তপাত করিয়া দিত, অথচ কালো লোকদিগের সেই দুঃখের সময়ে তাহাদের হইয়া দুটো কথা বলিবে, এমন একটী লোক সমস্ত আমেরিকা দেশে ছিল না।

কিন্তু পরমেশ্বর চিরকাল কাহারও কষ্ট রাখেন না, কাফ্রীদেরও কষ্ট চিরকাল রহিল না। আজ আমেরিকা দেশে কাফ্রীরা কাহারও অধীন নয়, আজ তাহারা সাদা লোকের মত নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। কিন্তু কাফ্রীদের এই স্বাধীনতা দুই এক দিনে হয় নাই। পরমেশ্বরের দয়ায় দুই একজন করিয়া সাদা-

লোকে কাফ্রীদের পক্ষ হইতে লাগিল, ক্রমে এই দলের সঙ্গে কাফ্রীদলেব শত্রুদের ভয়ানক যুদ্ধ হইল, দুই দিকেই অনেক লোক মারা পড়িল. তখন সকলে পবামর্শ কবিয়া কিছু দিন পবে দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিলেন, হতভাগ্য কাফ্রীদেব হাড়ে বাতাস লাগিল। আজ কাফ্রীবা স্বাধীন, কিন্তু ২০।৩০ বৎসব পূর্ব্বেও কাফ্রীদেব দিকে টানিয়া দুটো কথা বলিলে অনেক শত্রু যুঠিত। আজ প্রায় কুড়ি বৎসব হইল কাফ্রীদেব স্বপক্ষে কথা বলিতে গিযা এবং কাফ্রীদেব উন্নতিব জন্য চেষ্টা কবিতে গিয়া আমেবিকাব একজন সর্ব্ব প্রধান লোকের প্রাণ গিয়াছে ঃ—এই মহাত্মাব নাম **এব্রাহাম লিঙ্কন্।**

যাঁহাবা প্রথম্ হইতে 'সখা' পড়িয়া আসিতেছেন তাঁহাবা জানেন (সখা প্রথম ভাগ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) মহাত্মা গাব্ফীল্ড্ কেমন সামান্য অবস্থা হইতে নিজের চেষ্টা ও যত্নে আমেবিকার প্রেসিডেণ্ট্ অর্থাৎ মহাসভার কর্ত্তা হন। মহাত্মা লিঙ্কন্ গাব্ফীল্ডেব অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমেবিকার প্রেসিডেণ্ট হন। কি আশ্চর্য্য! দুজনেব জীবন চবিত ঠিক একরূপ। লিঙ্কন্ ও অত্যন্ত গরিবের ছেলে ছিলেন, এবং গার্ফীল্ডেব ন্যায় মায়ের গুণে সৎ চরিত্র এবং সু বুদ্ধি, এই দুই গুণ পাইয়াছিলেন। গাব্ফীল্ডেব ন্যায় লিঙ্কন্ও তেলেব অভাবে উনানের আগুনে পড়া কবিতেন, এবং শীতের দিনে শুধু পায়ে দুক্রোশ, আড়াই ক্রোশ পথ হাটিয়া স্কুলে পড়িতে যাইতেন। দুয়েরই পড়াতে এমন যত্ন ছিল, যে পড়িতে বসিলে আর জ্ঞান থাকিত না, একেবারে যেন নিজের পড়াতে ডুবিয়া থাকিতেন। একবার লিঙ্কনের বাপ তাঁহাকে কি কাজের জন্য ডাকিতেছিলেন; তখন লিঙ্কন্ একখানা গল্পের বই পড়ায় নিযুক্ত, বাপের কথা শুনিয়াও শুনিতে পাইলেন না; "যাই, বাবা!" বলিয়া আবার পড়িতে বসিলেন। লিঙ্কনেব বাপ লেখা পড়া জানিতেন না, পড়াব যে কি সুখ, তাহা তিনি বুঝিবেন কেন? ছেলের আসিতে দেবী হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে খুব তিবস্কাব কবিলেন।

বই কিনিবাব সঙ্গতি নাই, অথচ পড়া চাই; লিঙ্কন্ এক বড় লোকেব বাড়ী চাকব হইয়া তাহাব পুস্তক এবং সংবাদ পত্র পড়িতে লাগিলেন। এইরূপে সাহিত্য, ইতিহাস, আইন প্রভৃতি যে কত পড়িযা ফেলিলেন, তাহাব সীমা কি? কখন সামান্য চাকবেব কাজ কবিয়া, কখন ছুতবেব কাজ কবিয়া, কখন কেবাণীগিরির ন্যায় কাজ কবিয়া, কখনও জাহাজের মাঝিব কাজ কবিয়া, কখনও বা সৈনিকেব কাজ কবিয়া লিঙ্কনেব অনেক দিন কাটিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য। কোন কাজেই আপত্তি নাই, কিছুতেই "না" বলা নাই, আব যাহা ধবেন, তাহাই ভালরূপ না কবিযা ছাড়েন না। আবাব তাহাব সঙ্গে পড়াব কাজ—সে কাজেব বিশ্রাম নাই। এই রূপ চেষ্টা ও যত্ন যাব, সে যে বড় লোক হবে, তাহাতে আব অবাক্ হইবাব বিষয় কি? লিঙ্কন্ প্রথমতঃ তাদের দেশেব মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এবং তাহাব পর সমস্ত আমেবিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট হইলেন।

মহাত্মা গার্ফীল্ডের ন্যায় মহাত্মা লিঙ্কন্ও বড়ই দয়ালু ছিলেন। পশু পাখীদের প্রতি কেহ অত্যাচার কবিলে, লিঙ্কন্ তাহা সহ্য কবিতে পারিতেন না। যদিও বাল্যকালে গবিব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পেটের দায়ে বুনো পাখী শিকার কবিতে হইয়াছে, তথাপি নিষ্ঠুর ছেলেদের মত তিনি কখনই পশুপাখীদের যন্ত্রণা দিয়া মারেন নাই। এই দয়া বড় হইয়া, কেবল পশুপাখী নয়, সমস্ত দুর্ব্বল প্রাণীকেই আশ্রয় দিল। যে দুর্ব্বল, যে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারেনা, যে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারেনা, আহা।

এমন অসহায় যে তাহাকে দয়া কর, ইহাতেইতো বাহাদুরী; মহাত্মা লিঙ্কন্ এইরূপ মনে ভাবিতেন বলিয়াই তিনি কাফ্রীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সৎকাজ করিতে গিয়া তাঁহার প্রাণ গেল। কাফ্রীদের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনেক শত্রু যুঠিল এবং এক শত্রুর বন্দুকের গুলিতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার প্রাণ গেল।

প্রাণ যাক, তাতে দুঃখ কি, কিন্তু একজন সৎলোক এত শীঘ্র চলিয়া গেলেন, ইহাই কষ্টের কারণ। আর যদি মরিতে হয়, তবে এইরূপ সৎকাজ করিতে করিতে মরাইতো ভাল। কত লোক মদ খাইতে খাইতে মরিয়া যায়, কত লোক চুরি করিতে গিয়া মারা পড়ে, কতলোক পরের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া দাঙ্গা করিয়া মারা যায়, কত লোক টাকা রোজগার ও "যক্ষের ধন" পুঁজি করিতে করিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মুখে রক্ত উঠিয়া পৃথিবী ছাড়ে—সেইসব মরার অপেক্ষা সৎকাজ করিতে গিয়া প্রাণ দেওয়া কত সুখের, কত সৌভাগ্যের কথা। আজ যদি মৃত্যু আসে, তাহা হইলে সে যেন আসিয়া এই দেখিতে পায় যে মহাত্মা লিঙ্কনের মত আমরা নিজে ভাল হইয়াছি বা নিজেদের উন্নতি করিতেছি এবং আমাদের চেষ্টায় আর দশ জন সুখী হইতেছে এবং ভাল হইতেছে।

বালকের মন।

(ঠাকুরমার মৃত্যু দেখিয়া মাতার প্রতি বালকের উক্তি।)

(প্রাপ্ত।)

১

"কেনমা! ঠাকুমা আজি উঠানে শুইয়া?
কেনবা রেখেছে ওঁরে কাপড়ে ঢাকিয়া?
হাত পা নড়েনা কেন, শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড যেন,
পড়িয়া আছেন হায়! কেহ নাহি ধরে—
কেন সবে ধরাধরি আনেনাকো ঘরে?

২

"ওকিমা! চোখের পাতা পড়ে না যে আর—
বহেনা নিশ্বাস কেন বল দেখি তাঁর?
যাওনা মা ত্বরা করি, লয়ে এস হাত ধরি
জ্বরে বুঝি অচেতন হয়েছেন হায়—
যাও না মা! যাও যাও! ধরি তব পায়।

৩

"একি মা! কাঁদিছ তুমি কাহার লাগিয়া!—
চোখের জলেতে বুক যেতেছে ভাসিয়া।
লওমা আমারে কোলে, দুঃখ তব যাবে চলে,
ঠাকু'মা উঠিবে নিজে জ্বর গেলে পরে
হবেনা তোমার তাঁকে ধরে নিতে ঘরে।"

৪

চুম্বিলা জননী তায় তুলিয়া আদরে
দুখের মাঝারে সুখ উদিল অন্তরে—
বলিলেন "বাপধন! নন উনি অচেতন;
পরাণ উড়িয়া গেছে, আধার করিয়া
কে আর নাচাবে তোরে আদরে ধরিয়া?"

৫

"কেনমা অমন কথা বলিছ আমারে?
এই যে দাঁড়ায়ে আছি ঠাকুমার ধারে,—
আছে কি প্রাণের পাখা? তাহলে যেত যে দেখা;
ধরিতাম জোরে তারে দুই হাত দিয়া,
দিতাম বক্ষেতে তাঁর আবার ভরিয়া।"
হায়রে! অবোধ শিশু! ঠাকু'মা তোমার—
গেছে চলি; মিছে সাধ। আসিবে না আর।

সম্পাদকের পত্র।

তোমাদের সখা-সম্পাদক কিছুকালের জন্য বিদেশে গিয়াছেন; তিনি সেখান হইতে তোমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলাম।

(প্রথম পত্র।)

আমার প্রিয় বালকবালিকাগণ।

আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, এখন যেখানে আছি সেখানে ও তাহার চারিদিকে যত সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখিতে পাইতেছি তাহার কথা তোমাদিগকে বলি। পরমেশ্বর কত কত আশ্চর্য্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যাহারা দেশ বিদেশে বেড়ায় তাহা যত ভাল বুঝিতে পারে, এমন আর কে পারে? এই জন্য যাঁরা পাহাড় পর্ব্বত, নদী সাগর, সরোবর, হ্রদ, অগ্নির গিরি এবং বরফের গিরি, লবণের খণি এবং কয়লার খণি,প্রভৃতি দেখিয়া বেড়ান, তাহাদিগকে আমার বড়ই 'হিংসা' হয়। অনেক দিন হইতে মনে মনে ইচ্ছা ছিল দেশে দেশে ঘুরিব, কিন্তু এতদিন সে ইচ্ছা কাজে আসে নাই, এখন একটু একটু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়া এইখানে আসিয়াছি, কিন্তু আর যে বেশী দূর যাইতে পারিব, তাহা বোধ হয় না। ইহাই আমার বড় দুঃখের কারণ। তোমরা বোধ হয় জান যে, যে ব্যক্তি রসগোল্লার স্বাদ একবার পাইয়াছে, সে সর্ব্বদাই তাহা খাইতে চায়, আর জন্মেও ভুলে না; আমারও তাই হইয়াছে। এইখানে আসিয়া চারিদিকের সুন্দর শোভা ও চমৎকার শ্রী দেখিয়া আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, এখন ক্রমাগত এইরূপ দেশে ছুটিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়, কাজে আটকা-ইতেছে। তাই আমার কষ্ট। তোমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, সেই সময় তোমার চারিদিকে ভাল ভাল রসগোল্লা সাজাইয়া যদি তোমার হাত পা কেহ বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলে তোমার যেমন কষ্ট, আমারও তাহাই হইয়াছে। আমি চারিদিকের সুন্দর শোভার বাহার বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ ছুটিয়া গিয়া সেই শোভার নিকট বসিতে পারিতেছি না, এই আমার কষ্টের কারণ।

দুর্গাপূজার ছুটির সময় আমি কলিকাতা হইতে বাহির হই। এই আমার প্রথম পশ্চিমদিকে যাত্রা। তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমে থাকে, তারা হয়ত মনে মনে হাসিবে, কিন্তু আমি পশ্চিমে বর্দ্ধমানের এদিকে আর আসি নাই, কাজেই যতটুকু আসিয়াছি, তাহাতেই মনে হইতেছে ভয়ানক পশ্চিমে আসিয়া পড়িয়াছি। এই স্থানটীর জলবায়ু খুব ভাল, চারিদিকেই ছোট বড় পাহাড়, দেখিতে বড়ই সুন্দর। আমি যে বাড়ীতে থাকি তাহার বারাণ্ডা এবং উঠান হইতে গাঢ় ঘনমেঘের ন্যায় পরেশ নাথ পাহাড় দেখা যায়। এইখানে আসিয়া প্রথমেই দুটী বিষয় আমার চক্ষে লাগিল; প্রথমতঃ থাকিবার স্থান, দ্বিতীয়তঃ খাদ্য দ্রব্য। এখানে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই খোলার চাল, কোটাবাড়ী পাওয়া শক্ত—এপর্য্যন্ত মোটে তিনটী কোটাবাড়ী দেখিয়াছি,—একটা জমীদারের বাড়ী আর দুটো দোকান। খোলার বাড়ী গুলিতে জানালা প্রায় নাই, প্রথমে মনে হইল বুঝি বড় শীত বলিয়া জানালা রাখেনা,কিন্তু শেষে শুনিলাম,তাহা নহে। "সিন্ধুক্কা মাফিক্ ঘর" অর্থাৎ সিন্দুকের মত চারিদিকে আটা সাটা ঘরই এখানকার লোকের মনের মত। জানালা রাখিতে বলিলে, তাহারা চটিয়া যায়, বলে—"বাতাসই যদি খাবে, তবে মাঠে যাও না কেন?" এইতো ঘরের দশা।

তার পর খাদ্য দ্রব্যের কথা কিছু বলি। এদেশে ভয়ানক কাঁকর। ভাত, ডাল, তরকারি, সমস্ত জিনিষেই কে জানে কেমন করিয়া কাঁকর মিশিয়া থাকে,—কেবল দুধটা খুব ভাল ও খুব শস্তা। তরকারির মধ্যে কেবল ঝিঙ্গে ও লাউ, আর কিছু পাওয়া শক্ত। একটী বন্ধু আমার চাকরকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের এখানে পটল পাওয়া যায় না?" সে উত্তর করিল "পরোল? সেই বেগুনের মত? মিলে"!। বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন "চিচিঙ্গে পাওয়া যায়?" চাকর খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল "বাবু! ও আংরেজী বাত হাম নেহি সমঝ্‌তা হ্যায়" অর্থাৎ ও "ইংরেজী কথা আমি বুঝি না"॥

এখানকার যিনি জমীদার তাঁহাকে টিকাইত বলে। তাহার বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়। এখানকার কুঁমারেরা প্রতিমা প্রস্তুত করিতে পারে না, টিকাইতের বাড়ীর দুর্গা প্রতিমা আমাদের ওদিককার একজন কুমার আসিয়া তৈয়ার করিয়া দিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের দেশের প্রতিমায় ও এখানকার প্রতিমায় কোন তফাৎ নাই। তবে পূজার রকমে একটু তফাৎ দেখিলাম। আমাদের যেমন তিন দিন পূজা হয়, এখানে সেরূপ না হইয়া নবমীর দিন পূজা হইল। সেই দিন মস্ত মেলা বসিয়াছিল, এবং দুই তিন দল সাঁওতাল মেয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিয়াছিল। আমি সাঁওতালদের নাচ দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সাঁওতাল পুরুষেরা কেহ বাঁশি বাজাইতেছে, কেহ 'মাদোল' নামক মৃদঙ্গের মত একরূপ যন্ত্র বাজাইতেছে, আর দলে দলে মেয়েরা হাত ধরাধরি করিয়া গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতে করিতে মাদোলের তালে তালে নাচিতেছে। আমাদের দেশের কোমোর-দোলান বিশ্রী নাচের চেয়ে সাঁওতালদের নাচ অনেক ভাল। এই সাঁওতালদের সম্বন্ধে আর কিছু কথা বলিবার আছে, তাহা পরে বলিতেছি।

মেলাতে সাঁওতাল নাচ দেখিয়া আমরা কিছু উত্তরে পদ্ম-ঝিল দেখিতে গেলাম। সেই ঝিলটীতে রাশি রাশি পদ্ম ফুল ফুটিয়া থাকে। যাইবার সময় পথে এক যায়গায় ভয়ানক ভিড় দেখিয়া সেখানে দাঁড়াইলাম। কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতে কান্না পায়। দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড মাঠের এক পাশে একটা সাদা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে, আর এক পাশ হইতে বাবুরা 'বাজি' রাখিয়া বন্দুক চালাইতেছেন, কে ছাগলটাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে। শুনিলাম যাহার গুলিতে ছাগল মরিবে, টিকাইত তাহাকে পুরস্কার দিবেন। হায়! হায়! মূর্খদের কি দুর্ব্বুদ্ধি! আর নাইবা হবে কেন! যাদের "দারু" অর্থাৎ মদ না হইলে দিন চলে না, যাহাদিগকে মদ ছাড়িতে বলিলে, উলটে বলিয়া ফেলে "আপ কলম্ ছোড়িয়ে, তব হামলোগ্ দারু ছোড়েঙ্গে" অর্থাৎ "আপনি লেখাপড়া ছাড়ুন, তবে আমরা মদ ছাড়িব," যাহারা জুয়া খেলিয়া সমস্ত টাকাকড়ি নষ্ট করিতে বসিয়াছে তবুও সে পাপখেলা ছাড়িবে না, যাদের স্ত্রীপুরুষের দশহাজারের মধ্যে দশজন ধার্ম্মিক লোক পাওয়া যায় না, তাদের আর কত হবে! যাহাহউক, আমরা আর সেখানে দাঁড়াইলাম না, পদ্মঝিলের সুন্দর শোভা দেখিয়া এই ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিলাম যে, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সবই সুন্দর, কেবল মানুষই খারাপ।

সাঁওতালদের কথা বলিতেছিলাম, সাঁওতালেরা এর চাইতে অনেক ভাল। তাহারা অসভ্য বটে, বনে জঙ্গলে থাকে বটে, কিন্তু তাহারা কাহাকেও ঠকাইতে জানে না, চুরি বা মিথ্যা কথার কোন ধার ধারে না, এবং অত্যাচারে

কাহাকেও ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করে না। আজ কাল গাঁয়ের কাছে যারা থাকে, তাহারা দেখিয়া দেখিয়া দু পাঁচ জন ঠকামি শিখিয়াছে বটে, কিন্তু যেখানে ইহারা আপন মনে নিজের দলে, সভ্য লোকদের সীমার বাহিরে আপনাদের 'মাঝি' অর্থাৎ দলের কর্ত্তার অধীনে বাস করে, সেখানে ইহারা বড়ই ভাল লোক। আমি এক দিন এই স্থানের নিকটে এক যায়গায় পথ চলিতে চলিতে তৃষ্ণা হওয়ায়, কাছে একজন সাঁওতাল ক্ষেত চষিতেছে দেখিয়া তাহার নিকট জল চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে সাঁওতাল আমাদের লোকের নিকটে থাকিয়া কিছু সভ্য হইয়াছে, কাজেই ক্ষেতের কাজ ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না। আমি বলিলাম "বাপু! আমার তৃষ্ণায় প্রাণ যাইতেছে, একটু 'পানি' দিতে পার।" সে লোকটা কেউ মেউ করিয়া কি বলিল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দুটী দুই কথা বুঝিলাম—"কুঁইয়া? কুঁইয়া? হুইবে থাবরিয়া", অর্থাৎ "পাতকুয়া ওই থাব্‌রা অর্থাৎ খোলার বাড়ীর কাছে আছে"। সভ্য সাঁওতাল জল দিল না, কিন্তু অসভ্য সাঁওতালের কথা বলি শুন। আমি পরেশনাথ পাহাড়ে যাইতেছিলাম, পথে তৃষ্ণা হওয়াতে একটা জঙ্গুলে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। ছোট রাস্তা, দুপাশে বড় বড় কালকাশুন্দের গাছ। তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে এক সাঁওতালকে পাইলাম। সে একটী ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গরু চরাইতে যাইতেছিল। আমি জল চাহিবা মাত্র ছেলেটীকে গরুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া বড় সাঁওতাল নিজে বাড়ীতে গেল এবং পরিষ্কার মাজা ঘটিতে করিয়া আমাকে অতি সুমিষ্ট ঠাণ্ডা জল আনিয়া দিল।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন পুরুষ মানুষ দেখিলে লজ্জায় কোন্ কোণে পলাইবে, তাহার ঠিক থাকে না, সাঁওতাল মেয়েদের সেরূপ ভাব নহে। তাহারা নিঃসঙ্কোচে রাস্তা দিয়া ছেলেদের মাই খাওয়াইতে খাওয়াইতে চলিয়া যাইতেছে, কাহারও ভয় নাই। খুব গভীর জঙ্গলে যে সব সাঁওতাল থাকে, তাহাদের পুরুষ মেয়ে কেউ কাপড় পরে না, কেবল কোমরে পাতা সেলাই করিয়া জড়ায়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত যত সাঁওতাল দেখিয়াছি, তার মধ্যে পুরুষদের কাপড়ের কৌপিন এবং মেয়েদের প্রায় আমাদের মত বড় কাপড় এবং রূপার গয়না, মল, নথ, ইত্যাদি দেখিয়াছি।

আমার একটী বন্ধুর নিকট শুনিলাম অসভ্য সাঁওতাল যায়গা জমি লইয়া আমাদের মত মোকদ্দমা মামলা করেনা, জমীদার বেশী টাকা খাজানা চাহিলে সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এবং বনের মধ্যে আপনাদের 'মাঝি'র অধীনে অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া বাস করে। সাঁওতাল যে ঠকাইতে জানেনা, ইহা আমার কোন বন্ধু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কোন জিনিষের জন্য আগের দিন পয়সা দিলে, পরের দিন যে সেই দামের জিনিষ ঘরে বসিয়া পাইবে, এবিষয়ে তোমরা সভ্য জনকে, চতুর লোককে বিশ্বাস করিতে পার আর নাই পার, অসভ্য সাঁওতালকে বিশ্বাস করিতে পার। সাঁওতাল যে মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, তাহার একটা গল্প শুন। একবার এক সাঁওতাল অন্য একজন লোককে মারিয়া ফেলে। ইংরাজের রাজ্যে কি খুন করিয়া বাঁচিবার যো আছে? সাঁওতালকে ধরিয়া মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইল। একজন মোক্তার (সভ্য লোক কি না!) প্রাণপণে সাঁওতালকে শিখাইলেন, "বলিস আমি খুন করি নাই।" সাঁওতাল বলিল "আচ্ছা।" সকলি ঠিক। মাজিষ্ট্রেট সাঁওতালী ভাষায় জিজ্ঞাসা করাইলেন "তুমি অমুককে মারিয়াছ কেন?" সাঁওতাল বলিল "আমার এই এই ক্ষতি করিয়াছিল, মারিব নাতো কি?"

এবারকার এই পত্র বড় মস্ত হইয়া পড়িয়াছে আজ এইখানেই শেষ করি। আগামীবারে, কয়লার খনি, শ্লেটপাথরের নদী বা জল প্রপাত, এবং পরেশনাথ পাহাড়ের কথা বলিব। দেখিবার বিষয়, জানিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু যাহারা এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য দয়ার আশ্চর্য্য কাণ্ড বুঝিতে না পারে তাদের বেড়ানই মিথ্যা, তাদের চোখ কাণ কেবল বোঝার মতন, তাহারা চক্ষু থাকিতেও দেখে না এবং কাণ থাকিতেও শোনে না।

পচম্বা, গিরিধি। } তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
সম্পাদক।

গতবারের প্রশ্নের উত্তর।

১।-টিক্‌টিকি (টিক + টিকি)। ২।-বিলাতী দেশালাই। ৩। বিছা (বিছা + না)। ৪।-অভিধান।

নূতন।

১। বাজার পায়রা আমি অতি সুগঠন
দুই পক্ষে উড়ে ঘুরি ভারত ভুবন।
প্রাণপণে করি সদা পর উপকার
দুঃখ, চিন্তা, ভয় দূর করি সবাকার।
যার কাছে যাই কিন্তু চাকর হইয়া
এক পক্ষ কাটি সেই দেয় তাড়াইয়া।

২। কাপড় দিয়ে ঘর ছায় এমন ধনী কে?
সে ঘর অঙ্গুলে ঝোলে এমন ঘর সে।

৩। আমি একজন রাজা, কিন্তু আমার একটীও প্রজা নাই। আমার পোষাক সব রাজাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আমি অর্থহীন। আর দেবতাদের রাজা যা মাথায় পরে, আমার তাই সিংহাসন। বলত আমি কে?

৪। তিনটী অক্ষরে নাম যথা তথা মোর ধাম
কিন্তু দুই পাশে মোর বাস।
বাটী মোর কাড়ি নিল অমনি খেলিতে গেল
দেখ দেখ তাদের উল্লাস।

৫। যার আছে সে ব্যবহার করে না। কিন্তু যে ব্যবহার করে নিশ্চয় তার নাই। কি?

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতা ও মফঃস্বলে এক টাকা মাত্র। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটে, "সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকায় কমিশন বলিয়া /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে গড়ে দুইখানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালকবালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা-সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে, কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ধাঁধার উত্তর, আলোচনার বিষয়, বা সখায় প্রকাশ করিবার জন্য পত্র প্রভৃতি, পূর্ব্বের মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগের কার্য্যালয়ে পৌঁছা আবশ্যক।

২নং বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, কলিকাতা। } শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২ নং বেনিয়াটোলা লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় ভাগ। ডিসেম্বর, ১৮৮৪। ১২শ সংখ্যা।

লর্ড রিপন।

এখন যিনি আমাদের গবর্ণর জেনেরেল বা বড় লাট সাহেব তাঁহার নাম **লর্ড রিপন** এ কথা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে তিনি আর আমাদের বড় লাট থাকিবেন না। তাঁহার যত বৎসর কাজ করিবার কথা, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসাতে, তিনি বড় লাটের কর্ম্ম অন্য এক জনকে বুঝাইয়া দিয়া দেশে চলিয়া যাইতেছেন। আমরা এই দুঃখের সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদিগকে দুই একটী কথা বলিতে চাই।

দুঃখের সময় বলিলাম কেন, তাহার অর্থ আছে। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে যত 'বড় লোক' হয়, সে তত গরিবদের কষ্ট দেয়, অথবা গরিবদের কষ্ট দেখিয়াও সে তত কঠিন হইয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, জমীদার প্রজার দুঃখে কষ্ট পায় না, ধনী মহাজন গরিব চাষার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকা আদায় করিয়া লয়, এবং যাহার ক্ষমতা বেশী সে দুর্ব্বলকে চোখ রাঙ্গাইয়া, মুখ বাঁকাইয়া কথা কয়। অথচ যদি ঠিক বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে ব্যক্তি বলবান সে দুর্ব্বলকে সাহায্য করিবে, যাহার ধন আছে সে গরিবকে বিপদে রক্ষা করিবে, এবং যে রাজা সে আপনার প্রজাকে সুখে বাঁচাইয়া রাখিবে,—ইহাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু লোকে এরূপ করে কই? আমরা কেবলি দেখিতে পাই যে, যে পারিতেছে, যার ক্ষমতা আছে, সেই আপনার আশ্রিত অধীন লোকের উপর উৎপাত করিতেছে।

যেখানে ক্ষমতা, তার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচার। পরের উপকারের জন্য যে ক্ষমতা চালান যাইতে পারে, চারিদিকের ক্ষমতাশালী লোকের 'বকম সকম' দেখিয়া তাহা আর বিশ্বাস কবিতে মন উঠে না।

আমাদের বড় লাট বাহাদুরের ভয়ানক ক্ষমতা, তিনি কয়েক বৎসরের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের রাজা হইয়া থাকেন, একথা বলিলে কিছু অধিক বলা হয় না। লর্ড রিপনের আগে যিনি বড় লাট ছিলেন, তিনি আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে আমরা মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে না পারি, তাহার জন্য আমাদের খবরের কাগজগুলোকে একটা কড়া আইনের দ্বারা বাধিয়া ফেলিয়া চোখে চোখে রাখিতে লাগিলেন, আমাদের বন্দুক, তরবারি, যাহা কিছু অস্ত্র শস্ত্র ছিল সমস্ত কাড়িয়া লইলেন, আরও কত কি কাণ্ড করিলেন, সে সব তোমাদের বলিয়া লাভ নাই। সেই লাট বাহাদুর কেবল মুখেই মিষ্ট কথা বলিতেন, আর কাজের বেলা প্রায়ই ইংরাজদের দিকে টানিয়া কাজ করিতেন। আমরা হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া 'প্রাণ যায়' 'প্রাণ যায়' করিতেছিলাম, এমন সময় লর্ড রিপন আসিলেন। তিনি আসিয়াই এদেশের শ্রী ফিরাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ গুলির বাঁধন খুলিয়া দিলেন। ইংরাজেতে আর এদেশীয় লোকে কোন তফাৎ রহিল না। যে গুণী সেই সম্মান পাইবে, মুখ দেখিয়া কাহাকেও চাকরী দেওয়া হইবে না, এ কথা লর্ড রিপন সকলকে বলিলেন এবং কাজেও সেইরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল ইংরাজ অত্যাচার করিয়াই দিন কাটায়, লর্ড রিপনের এই সমান সমান ভাবটা তাহাদের চোখে সহিল না; তাহারা তাঁহার ভয়ানক শত্রুতা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিছুতেই না টলিয়া যাহাতে ইংরাজ এবং দেশীয় লোক সকলেরই উপকার হয়, অথচ ধর্ম্ম এবং ন্যায় বজায় থাকে, সেইরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত সেই ভাবেই কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তবে, তিনি চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মত আর যে কেউ হবে, এ ভরসা আমাদের নাই বলিয়াই এ সময়টা বড় দুঃখের সময় বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি অনেক সৎকাজ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সেগুলির এক এক করিয়া নাম না করিয়া, এই বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে, যে তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের দ্বারা প্রত্যেক কার্য্যের পরিমাণ করিতেন, অর্থাৎ সে কার্য্য ধর্ম্মের কার্য্য বা যে কার্য্য না করিলে অন্যায় হয়, সে কার্য্য তিনি করিয়া তুলিতেন। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই লর্ড রিপন থাকিতেন, যেখানে ন্যায় সেইখানেই লর্ড রিপনের কার্য্য দেখা যাইত, তিনি ইংরাজ, বাঙ্গালী বুঝিতেন না, সদা কাহারো ধার ধারিতেন না, কেবল আপনার মনে, যাহা ধর্ম্ম, যাহা ন্যায, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করিয়া যাইতেন।

আমরা তাঁহার এইরূপ কার্য্যেই সুখী হইতে পারিয়াছি, কারণ আমরা বরাবরই জানি যে আমরাই কষ্ট পাই, আমরাই কালো বলিয়া গুণ থাকিলেও চাকরী পাই না, আমরাই অত্যাচারী ইংরাজদের লাথি কীল ঘুষা খাই; কাজেই লর্ড রিপনের যাহা কিছু কার্য্য তাহা আমাদের উপকারের জন্যই হইয়াছে। আজ সেই লর্ড রিপন চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আমাদের মনে মনে কষ্ট হইতেছে, আজ আমরা মনে মনে এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেখানে থাকেন, যেন সেইখানেই সুখে থাকেন এবং গরিব ভারতবাসীদিগকে যেন তাঁহার ধার্ম্মিক মনের একপাশে একটু স্থান দেন।

বড় লোক কিসে হয়?

("সহজে কি বড় লোক হওয়া যায়?"
এই গল্পের শেষ।)

সহজে কি বড় লোক হওয়া যায় এই নামের প্রস্তাবটী শেষ করিবার সময় আমরা গিরিশের পরে কি হইল তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। কিন্তু গিরিশের জীবনে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল যে আমরা সে সব বলিতেও কষ্ট বোধ করি। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে বেচারা কোন দিনই বড লোক হইতে পারে নাই। দুঃখ কষ্টের এক শেষ তাহার জীবনে হইয়াছিল। পরিশেষে সে নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করিয়া দিল।

গিরিশের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে মোটামুটি সকল গুলিই সত্য। কথাগুলি যথার্থ বলিয়াই সে গুলি এত গুরুতর। তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, আমরা যদি তাহার মতন কাজ করি, কে জানে, কোন দিন আমাদের সম্বন্ধে ও কেহ এইরূপ গল্প সকল বলিয়া লোককে সাবধান করিবে না। পরে কষ্ট পাওয়ার চাইতে আগে সতর্ক হওয়া ভাল।

বড় লোক হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই কিছু বড় লোক হয় না, তাহা হইলে অত কম লোক বড় লোক হইতে দেখিতাম না। ইচ্ছাতো সকলেরই আছে, তোমার আমার কি নাই? কিন্তু আমি যে আজিও ছোট লোকই রহিয়াছি! শুধু ইচ্ছা থাকিলেই বড় লোক হয় না; ইচ্ছার খুব দরকার, কিন্তু আরো কিছু চাই। গিরিশের ইচ্ছা যথেষ্ট ছিল। তাহার পক্ষে যত টুকু কুলাইয়াছিল সে তো চেষ্টারও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু তবুও যে সে বড় লোক হইল না? হইবে কেমন করিয়া? কি রূপে কি করিতে হইবে তাহা যদি না জানিলাম, তবেতো সেই গাধা রামকান্তের মতই রহিলাম। রাম ক্লাশে একদিনও উপরে উঠিতে পারিল না, নীচে নামিবারও জায়গা ছিল না। গুরু মহাশয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন "ওরে তোর আর কি কিছু হবে। ভাল ছেলে হ'তে হ'লে তেল পোড়াতে হয়, খাট্‌তে হয়, কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হয়।" রামকান্ত এক দিন বাড়ী আসিয়াই দু সের তেল কিনিয়া আনিল। ঐ তেলে কাপড ভিজাইয়া তাহাতে আগুণ লাগাইয়া দিল। তার পর ঘরের চালে দড়ি বাঁধিয়া তাহাতে প্রাণপণে দুলিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে দড়ি ছিঁড়িয়া আগুণের উপর পড়িয়া অর্দ্ধ দগ্ধ, অদ্ধ ভগ্ন শরীরে নিষ্কৃতি পাইল। যে দুই সপ্তাহ শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিল, মাষ্টার মহাশয ভুল করিয়াছেন। সে সবল লোক, যেদিন স্কুলে গেল সে দিনই মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিল। রামকান্তের যে ভুল গিরিশ বেচারারও সেই ভুল। ভাই, আমরা যে বড় লোক হই না, আমাদেরও অনেকের সেই ভুল। যদি বড় লোক হইতে ইচ্ছা থাকে— 'নাই' যদি বল তবে আমি হাসিব—তবে প্রথমে কি কি কাজ করিলে বড় লোক হয়, বেশ করিয়া জান। তারপর নিঃশব্দে শান্তভাবে আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। অনেক কষ্ট পাইতে হইবে; তাহার জন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতা চাই। অনেক সুখ পায়ে ঠেলিতে হইবে; তাহার জন্য সমুচিত ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। এত করিয়াও কত জন উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে বড় হইতে পারিতেছে না। তুমি ও পারিবে কি না জানি না—আমি ইচ্ছা করিতেছি তোমরা সকলেই পারিবে।— কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে তোমার পক্ষে যতটুকু হওয়া সম্ভব তাহা হইতে গেলেই আমি যাহা যাহা বলিলাম সব কয়টি করিতে হইবে।

বড় লোক, বড় লোক, এতবার বলিলাম। কিন্তু যতজন বড়লোক হইতে চাহিতেছেন সকলেই কি বুঝিতে পারিতেছেন যে বড় লোক হওয়ার অর্থ কি? একটা লোক বলিতেছিল যে আমার ছেলের বিবাহেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বল ত দেখি লাক টাকা বলিলে কতগুলি টাকার কথা বলা হয়?' সে বলিল 'কেন, লাক টাকা আর লাক টাকা, ছকুড়ি দশ টাকা।' বড় লোক হওয়া সম্বন্ধে ও অনেকের ঐরূপ মত। অনেকের কেবল নিজের বেলাই ঐ মত। তাহারা বড় ছোট লোক। ভাই, বড় লোক না হও দুঃখ নাই, কিন্তু ছোট লোক হইও না।

কোন ভাল বিষয়ে খুব ভাল হইলে বড় লোক হয়। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় লোক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় লোক, লর্ড রিপন বড় লোক, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বড় লোক, সুরেন্দ্র বাবু বড় লোক ইত্যাদি। ইহাঁদের সকলেই এক বিষয়ের জন্য বড় হন নাই। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখিবে ইহাঁদের যাঁহার মধ্যে যে টুকু ভাল তাহার জন্যই তাঁহাকে বড় লোক বলা হয়। বড় চোরকে ও বড় লোক বলা হয় না, বড় ডাকাতকে ও বড় লোক বলা হয় না।

আর এক কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যার জন্য আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলি না। মহেন্দ্র বাবু নিজের ঘরে কবাট দিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে আমরা তাঁহাকে অত বড় লোক বলিতাম না, অন্ততঃ তাঁহার প্রতি আমাদের অত শ্রদ্ধা হইত না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড রিপন, ইহাঁরা কে কি শাস্ত্র অধিক জানেন, কি কিই বা জানেন না তাহার হিসাব ও হয়তো আমরা কেহ দিতে পারিব না। সুরেন্দ্র বাবুর স্কুল আছে সেখানে তিনি পড়ান এজন্য তাঁহাকে কেহ বড়লোক বলে না। যিনি যে পরিমাণে লোকের উপকার করিতেছেন তিনি সেই পরিমাণে লোকের ভালবাসা পাইতেছেন। বড়লোক এবং ভাল লোক, এ উভয় হইলেই যথার্থ বড়লোক। বড়লোক হওয়া যেরূপই কঠিন হউক না কেন, ভাল লোক চেষ্টা করিলেই হওয়া যায়। এবং তাহাই আগে হওয়া উচিত। কাহারও যদি এক কোটী টাকা থাকে তাঁহাকে শুদ্ধ ঐ টাকা গুলির জন্য বড় লোক বলিব না। তিনি নিজের সদ্গুণের সাহায্যে উহা উপার্জ্জন করিয়া থাকিলে অবশ্য তাঁহাকে বড় লোক বলিব। কিন্তু যখন দেখিব তিনি ঐ টাকা দিয়া দেশের উপকার করিতেছেন, তখনই তাঁহাকে যথার্থ বড় লোক বলিব। কারণ, তখন তিনি বড় লোক এবং ভাল লোক উভয়ই হইয়াছেন। বড় লোক বড়, ভাল লোক ভাল, বড় লোক ভাল হইলে বড় ভাল।

বোকা রামমোহন।

আমরা এক বৎসর পূর্ব্বে (গত বৎসরের ডিসেম্বার মাসের সখায়) হাবা গঙ্গারামের কথা লিখিয়াছি। তখনই বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে লোকে যারা বোকা তাহাদিগকে 'বোকা রামমোহন' বলিয়া ঠাট্টা করিয়া থাকে। আমরা অনেক কষ্টে এই বোকা রামমোহনের কতকগুলি গল্প জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব।

বোকা রামমোহন বাঁকুড়া জেলার এক ভট্টাচার্য্যের ছেলে। রামমোহনের বড় ভাইয়ের নাম হরিমোহন। তিনি বেশ্ লেখাপড়া জানেন। যেখানে তাঁহাদের বাড়ী সেখান হইতে ১০ ক্রোশ

দূরে, এক রাজার বাড়ীতে হরিমোহন সভা-পণ্ডিত। তিনি ছমাস নমাসে এক আধ বার বাড়ীতে আসিতেন। ছোট ভাই রামমোহনই বাড়ীর কর্ত্তা। বাড়ীতে একটী বিধবা ভগ্নী আর একটী চাকর। হরিমোহনের স্ত্রী এবং গোপাল নামে একটী ছেলে, তাঁরা কখনও ওখানে কখন হরিমোহনের শ্বশুর বাড়ীতে থাকেন।

একবার গোপালের মামার বাড়ী হইতে খবর আসিল, গোপালের মার বড় ব্যারাম। রামমোহন খবর পাইয়া বলিলেন—"এইখানে আস্‌তে বলগে যাও।" যে খবর আনিয়াছিল, সে বলিল "বিছানা ছেড়ে চল্‌তে পারেন না, কেমন ক'রে আস্‌বেন?" রামমোহন উত্তর করিলেন "তা' বিছানা ছেড়ে আস্‌তে কে বল্‌ছে, বিছানা শুদ্ধই আসুন না।"—পাশে বিধবা ভগ্নী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন—"বলিস্ কি, আহাম্মকের মত? আজই খেয়ে দেয়ে দাদার কাছে খবর নিয়ে যা। তিনি যা বলেন, তাই করতে হবে।" রামমোহন কিছু থতমত খাইয়া বলিল "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি; কিন্তু তোমাদের, বাপু! যেন কেমন কেমন বুদ্ধি! বিয়ে না, শ্রাদ্ধ না, নেমন্তন্নের বিদায় না, খপ্ ক'রে খবর দিতে গিয়ে হাজির হব, দেখে শুনে দাদা কি বল্‌বে?" এই বলিয়া রামমোহন যাইবার আয়োজন করিতে পাড়ায় গেলেন।

পাড়ার কেশব ভাণ্ডারী অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছে, এবং অনেক রকম খবর রাখে। আমাদের রামমোহন এই কেশব ভাণ্ডারীর কাছে পরামর্শের জন্য আসিলেন এবং বলিলেন "ভাণ্ডারী দাদা! একবার দাদার কাছে যেতে হবে; কেমন ক'রে, যাওয়া যাবে বলতো।"—ভাণ্ডারী বলিলেন "এই, খাওয়া দাওয়া ক'রে, হেটে গেলে, তুমি যে রকম চল, তাতে রাত দেড় প্রহরের সময় যেতে পার্‌বে। আর যদি ঘোড়ায় যাও তাহ'লে একপ্রহর বেলা থাক্‌তে যেতে পার। এখন যেটা তোমার সুবিধা।" রামমোহন বলিলেন—"তবে ঘোড়াতেই যাব।" গাঁয়ের এককোণে ফকীরে হাড়ির বাড়ী; তাহার ভাল একটা ঘোড়া আছে, শুনিয়া রামমোহন তাহার নিকট গেলেন। ফকীর যখন শুনিল, রামমোহন তাহার ঘোড়ার জন্য আসিয়াছেন, তখন সে তাড়াতাড়ি সুন্দর ঘোড়াটী সাজাইয়া রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত রাখিয়া গেল।

রামমোহনের বিশ্বাস ছিল, সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে পারে। রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া, হাতে ছড়ি লইয়া লাফাইয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল। ঘোড়াও আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। ফকীরে হাড়ি খানিকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিল। যতক্ষণ সে সঙ্গে ছিল, ততক্ষণ ঘোড়াটী চলিয়াছিল। কিন্তু আর চলে না। কি রকম লোক পিঠে চাপিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ঘোড়া পেছনে হাটিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে একটু চলিতে লাগিল। রামমোহন ভাবিলেন "স্রোতের উল্টাদিকে নৌকা পড়িলে, যেমন 'গুণ' টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়, ঘোড়ারও বুঝি সেই রকম করিতে হয়।" এই ভাবিয়া রামমোহন ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটাকে এবং নিজের 'জালা'র মত শরীর, এই দুটোকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। ঘোড়া দেখিল মজা মন্দ নয়; সেও সুবিধা বুঝিয়া, যখনই রামমোহন পিঠে চাপিতে যায়, তখনই দুষ্টামি করিয়া পেছনে হাটিতে থাকে। বেচারা রামমোহন কি করেন, কাজেই 'গুণ টানা'-গোছ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় দাদার বাড়ীতে পৌঁছিলেন। তাহার পরদিন রামমোহন বাড়ী ফিরিলেন; আসিবার সময় ঘোড়াটা বেশ্ চলিয়া আসিল। বাড়ীতে আসিয়া ঘোড়া ফিরাইয়া দিয়াই রাম-

মোহন ভাণ্ডারী দাদার কাছে গেলেন এবং চোখ লাল করিয়া বলিলেন—"তোমাকে বুদ্ধিমান বলে তোমার পরামর্শ নিতে এসেছিলাম, তা বেশ্ পরামর্শই তুমি দিয়েছিলে। ঘোড়ায় গেলে কখনই হেঁটে যাবার আগে যাওয়া যায় না, আবার মধ্যে থেকে 'গুণ' টেনে প্রাণ যায়।" কেশব ভাণ্ডারী সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল "ঘোড়ার পিঠে মানুষই চড়ে, তাই জান্‌তাম, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে গরু চাপিলে ঘোড়া চলিবে কেন?"

গোপালের মার ব্যারাম সারিয়া গেল, কিন্তু তিনি অনেক দিন বাপের বাড়ীতে আছেন, একবার খবর লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া রামমোহনের ভগ্নী একদিন রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, অনেক দিন হইল গোপালদের খবর পাই না, তুমি এক কাজ কর, তারা কে কেমন আছে, খবর জেনে এসো। এই দুটী টাকা নেও, পথ থেকে তাদের জন্যে যা'হয় কিছু কিনে নিয়ে যেও।" রামমোহন টাকা দুটী চাদরে বাঁধিয়া ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে চলিলেন। যাবার সময় ভগ্নী বলিয়া দিলেন "দেখ, তুমিতো যে বোকা, ভদ্রলোকদের বাড়ীতে যাচ্ছ, বেশী কথা ব'লে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ক'রে বকনা, তারা যেটী জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি সেইটীরই উত্তর দিও; অনেক কথা ব'লনা—মাথা হেঁট করে থাকবে; তারা পাঁচটা কথা বলিলে তুমি একটা বলিবে, বুঝিলে?" রামমোহন একে পুরুষ মানুষ, তাতে নিজের খুব বুদ্ধি আছে এই তাঁহার বিশ্বাস,—কাজেই একজন মেয়ে মানুষ মুখ নেড়ে বোকা ব'লে উপদেশ দেয়, ইহা তাঁহার বড়ই কষ্টের কারণ হইল। তিনি ভগিনীর কথায় বলিলেন—"বুঝেছিগো, বুঝেছি। এমনিই বোকা পেয়েছ, সব ঠিক ক'রে আসব।"

এই বলিয়া রামমোহন বাড়ীর বাহির হইলেন। পথে গিয়া মনে হইল গোপালের জন্য 'যাহয় কিছু' কিনে নিয়ে যেতে দিদি বলিয়া দিয়াছেন। তাই, একটা বাজারের কাছে গিয়া রামমোহন এক দোকানে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো, তোমাদের এখানে 'যাহয় কিছু' পাওয়া যায়?" দোকানদার একজন নাপিত, ভয়ানক দুষ্ট লোক। সে বলিল, "পাবেন, কিন্তু সে দামী জিনিষ, দোকানে রাখি না, বাড়ীতে আছে। দুটাকা ক'রে সের পড়্‌বে। আপনার কতটুকু চাই।" রামমোহন বলিলেন—"এক সের।" নাপিত বলিল—"আচ্ছা, তবে আপনি এই দোকানে একটু বসুন. আমার বাড়ী কাছে, ওই দেখা যায়, এখনি নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলিয়া নাপিত মনে মনে হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে গেল, এবং কতকগুলো চুল এবং নখ একসঙ্গে একটা হাঁড়িতে পূরিয়া তাহার মুখে ভাল ক'রে ন্যাকড়া জড়াইয়া দিল। পরে সেই হাঁড়িটী হাতে করিয়া দোকানে আসিয়া রামমোহনকে দিল। রামমোহন বলিলেন—"ঠিক ওজনে দিয়েছতো?" নাপিত বলিল "ও আর দেখ্‌তে হবে না। বাড়াতে গিয়ে মেপে নেবেন।" রামমোহন এই কথাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নাপিতকে দুটা টাকা দিয়া চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে রামমোহন দাদার শ্বশুর বাড়ীতে পৌছিলেন এবং পৌছিয়াই হাঁড়িটী বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। গোপালের মা হাঁড়ি খুলিয়াই অবাক্। বুঝিলেন, "ঠাকুরপো তামাসা করিয়াছেন।" কিন্তু এদিকে যে ঠাকুরপোকে নাপিতের পো তামাসা করিয়াছে, তাহাতো আর তিনি জানেন না!! রামমোহন বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী স্ত্রীলোক ভিতরবাড়ী হইতে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পথে আস্‌তে কোন কষ্ট হয়নি তো?

গোপালের বাপ কেমন আছেন ?"—রামমোহন ভগিনীর কাছে শুনিয়া আসিয়াছিলেন "পাঁচটা কথা বলিলে তবে একটা কথা বলিতে হয়," মোটে একটা কথা বলা হইয়াছে, এর মধ্যেই কথা বলিলে এরা বোকা মনে করিবেন, কাজেই রামমোহন চুপ করিয়া মনে মনে, কটা কথা হয়, তাহাই গুণিতে লাগিলেন,—"এই এক।" স্ত্রীলোকটী আবার বলিলেন, "কথা কওনা যে, গোপালের বাপের কোন অসুখ হয়নিতো।" রামমোহন এবারেও চুপ, মনে মনে গুণিলেন "এই দুই।" স্ত্রীলোকটী কিছু ভয় পাইয়া বলিলেন "ওমা। ও কিগো। তবে কি কিছু 'ভালমন্দ' হ'ল নাকি ?" রামমোহন মাথা হেঁট করিয়া গুণিলেন "এই তিন," তখন মেয়েমহলে ভয়ানক কান্নার ধুম পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া পাড়ার অনেক লোক আসিয়া যুটিল। রামমোহন দেখিলেন পাঁচটার অনেক বেশী কথা চলিতেছে, তখন তিনি মুখ খুলিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কান্না কন ?" তিনি বলিলেন "বলেন কি মশাই ? গোপালের মা বিধবা হ'ল,—ওর চাইতে কি আর কিছু কষ্ট আছে ?" রামমোহন বুঝিলেন গোপালের মার বড় একটা বিপদ ঘটিয়াছে, বড় দুঃখ হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। আসিয়াই দিদিকে দেখিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে রামমোহন বলিয়া উঠিলেন—"দিদি সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ হয়েছে। গোপালের মা বিধবা হয়েছে।" দিদি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "রক্ষা কর! আরে আহম্মক! তাও কি কখনও হয় ?" রামমোহন তখন চোখের জল মুছিয়া বলিলেন—"তোমার বিশ্বাস না হয়, নাই মান্‌লে, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম গোপালের মা বিধবা হয়েছে বলে বাড়ীর সকলে কাঁদ্‌ছে।" ভগিনী কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ও অলক্ষ্যণে কথা আর বলিস্‌নে। দাদা বেঁচে আছেন, গোপালের মা কি করে বিধবা হবে ?" রামমোহন কিছু থতমত খাইয়া বলিলেন, "দাদা বেঁচে আছেন, তাতেই কি একজন মেয়ে মানুষ বিধবা হবে না ? ভাল দাদাতো বেঁচে আছেন, তাহলে তুমি বিধবা হলে কেন ?"—তখন তাহার ভগিনী তাহাকে বিলক্ষণ তাড়া দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং একখানা পত্র লিখিয়া কেশব ভাণ্ডারীকে দিয়া তখনই গোপালের মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

সেই অবধি রামমোহনের নাম 'বোকা রাম মোহন' হইয়া গেল, এবং সেই অবধি লোকে নির্ব্বোধকে গালাগালি দিতে গিয়া 'বোকা রামমোহনের' নাম করিতে লাগিল।

চিরদিন কি দুঃখে যায়?

দশম অধ্যায়।

রাজকুমার বাবু বাড়ীতে গিয়াই স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিলেন। তিনি ছোট বেলায় অজিতের মার সহিত এক ক্লাশে পড়িয়াছিলেন। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আর বাস্তবিক—কিরণমালা অত্যন্ত ভাল মেয়ে ছিলেন। এমন প্রফুল্ল, এমন সরল, এমন বুদ্ধিমতী, এমন 'মিশুনে'—তাঁহার এই সব গুণ থাকাতে ক্লাশের সকল মেয়েই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই সমপাঠী—ননদিনীর—পুত্র অজিৎ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। বিবাহের পর আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই বলিয়া ইন্দুরেখা তাঁহার সহিত দেখা না হউক—তাঁহার সন্তানকে তো পাইয়াছেন, এই ভাবিয়া

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এ সব কাণ্ড তাঁহার নিকট ভেল্কীর মত বোধ হইতে লাগিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তবে কি অজিৎ আমাদের আপনার ধন। চল অজিৎকে বলিগে?" এই বলিয়া—তিনি অজিৎকে ডাকিয়া সব বলিলেন, অজিৎ অবাক্ হইয়া সব শুনিল। অজিৎ এমন অবাক্ তাহার জীবনে কখন হয় নাই। তার কাছে সব ঠিক স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইন্দুরেখা দেবী তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া কোলে টানিয়া লইয়া আদরে মুখ চুম্বন করিবামাত্র, অজিৎ তাঁহার গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ইন্দুরেখা দেবীও ধীরে ধীরে আঁচল দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "অজিৎ ধন! কেঁদনা। তুমি আমাদের আপনার। এই তোমার আপনার বাড়ী। আমি তোমার মামী মা ঐ তোমার মামা। কাঁদ কেন বাবা। চুপ কর কেঁদ না।" অজিৎ কাঁদিতে কাদিতে বলিল, "আজ থেকে তবে তোমায় মামী মা বলিয়া ডাকিব। মামা বাবু! আমার দিদী কি বেঁচে আছে? আমার বোন আছে? আমার সকলেই আছেন! এ সব কি হ'ল? তোমরা যখন আমাকে নিয়ে এসেছিলে তখন কি তোমরা জান্‌তে যে আমি তোমাদের আপনার ছেলে? আর আমি তখন জানিতাম না যে তোমরা আমার আপনার।"

রাজকুমার বাবু। আশ্চর্য্য মিলন! ইন্দু! এস আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, যে তিনি আমাদের আপনার ধনকে আমাদের হাতে দিলেন!—এই বলিয়া রাজকুমার বাবু ও ইন্দুরেখা দেবী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া রহিলেন। অজিৎ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমার বাবু অজিৎকে বলিলেন "অজিৎ! আজ তুমি পূর্ণ নাম পেলে। তোমার নাম 'অজিৎকুমার রায়।' তোমার বাবার নাম শ্রীশচন্দ্র রায়। তোমার মার নাম কিরণমালা রায়। তোমার বাপ মা এখন আর এ জগতে নাই। তাঁরা পরকালে ঈশ্বরের কাছে—সুখে আছেন। তোমার বাবা যখন তোমার মাকে লইয়া চলিয়া যান তখন তোমরা হও নাই। হবার পরও তোমার বাপ মার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নাই। তোমার বাবাকে আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। দেখিতেও খুব সুন্দর ছিলেন। তোমার মুখ খানিকটা তোমার বাবার মত হয়েছে। তোমার মা এমন ভাল মেয়ে ছিলেন, দেখ্‌তে বড়ই সুন্দর ছিলেন। তোমার চোখ দুটী তোমার মার মত—আর কিছুই প্রায় হয় নাই। আমি তাকে বড় ভালবাসিতাম। কিরণ আমার চেয়ে পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল। কিরণকে শ্রীশ বাবু বাড়ী থেকে নিয়ে গেলে আমি কত কাঁদিয়াছিলাম। কত চিঠি লিখিয়াছিলাম কিন্তু একখানারও উত্তর পাই নাই। বোধ হয় চিঠি পায় নাই, কিরণ আমার নিকট দুই তিন খানা চিঠি লিখিয়াছিল। একখানাতে বাড়ীর জন্য মন কেমন করে বলিয়া লিখিয়াছিল; আর এক খানা ঊর্ম্মিলা হবার পর লিখেছিল, তাতে—তারা অনেক দূর দেশে আছে ভয়ানক কষ্ট হয়, শ্রীশ বাবু চাকরি করেন—তাই লিখিয়াছিল; আর এক খানা তোমার বাবা মারা গেলে। শেষখানা পড়িয়া আমি যে কত কাঁদিয়াছিলাম বলিতে পারি না। আমি তোমাদের আনিবার জন্য বাড়ী গিয়া দেখি, তোমার মা সে বাড়ীতে নাই। তার পর আর কোন খবর পাই নাই। বাবাকেও কিরণ চিঠি লিখিয়াছিল। বাবা তার উত্তর দিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু কিরণ বাবার আদুরে মেয়ে ছিল। আমরা কেমন দুই ভাই বোন ছিলাম! আমরা পুরাণ বাড়ী থেকে উঠে আস-

সখার ক্রোড়পত্র।

ডিসেম্বার, ১৮৮৪।

সখার দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইয়া গেল। অনেকে সখা পাঠ করিয়া উপকার লাভ করিয়াছেন-এবং আমাদিগকে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে আমরা সখার দিন দিন আরও উন্নতি করিতে চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে যাঁহারা উপকার পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে যদি বুঝাইয়া বলিয়া অন্ততঃ আর একজনকেও সখার গ্রাহক করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা কত আহ্লাদিত হই!

গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন আগামী বৎসরের অগ্রিম মূল্য জানুয়ারি মাসের মধ্যেই পাঠাইয়া বাধিত করেন। সখার ক্রমোন্নতি গ্রাহক গ্রাহিকাগণের নিয়মিত মূল্য দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; ভরসা করি তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মূল্য জানুয়ারি মাসের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

গত বৎসর অনেকেই প্রথমতঃ টাকা দেন নাই, ছয় মাস তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে কাগজ দিয়াছি এবং টাকা পাঠাইবার জন্য পত্রাদিও লিখিয়াছি; তৎপরে টাকা না পাইবার দরুণ কাগজ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল—এই জন্য আমাদের বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। এবৎসর আমরা বৎসরের প্রারম্ভেই সানুনয়ে গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন অগ্রিম মূল্য জানুয়ারি মাসের মধ্যেই পাঠাইয়া বাধিত করেন; এবৎসর আমরা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ক্ষতি-স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,
সখা-কার্য্যাধ্যক্ষ।

বাব পব আব চিঠি পাই নাই। শ্রীশ বাবুকে বাবা ছেলেবেলা থেকেই ভালবাসিতেন। তাই তার বড় অভিমান হয়েছিল। যদি কিরণ অত দূব দেশে গিযা না পড়িত, তাহ'লে বোধ হয় আবাব বাড়ীতে আসিত। সে কত দেশ বেড়াইযাছে, কত বিপদে পড়িযাছে তাহা ঠিক নাই। অজিৎ! আয তোকে বুকে কবে নিই, তুই আমাব কিরণের ধন! তুই আমারও প্রাণেব ধন! কিবণ! আমাব কিবণ! তোমায ছেলেবেলা কত বকিযাছি, কত মাবিয়াছি। তুমি 'দাদা! দাদা!' কবে পাগল হতে, আমাব কাছে মাব খেযে কখন বাবাকে বলে দাও নাই। আমাকে বাবা বক্‌লে তুমি বাবাকে বল্‌তে 'বাবা! তোমাব ছুটী পাযে পড়েছি, দাদাকে বকো না, দাদা আব কব্‌বে না।' তুমি এমন বোন ছিলে। তোমাব সঙ্গে আমাব আর এ পৃথিবীতে দেখা হল না। কবে সে দিন হবে, যে দিন তোমাব সঙ্গে পবকালে সাক্ষাৎ হবে।" —এই বলিযা রাজকুমাব বাবু অজিৎকে বুকে জড়াইযা কাঁদিতে লাগিলেন। অজিৎ মামা বাবু ও মামী মাকে কাঁদিতে দেখিয়া আবাব কাঁদিতে লাগিল। কি চমৎকাব দৃশ্য! কি সুন্দব মিলন!

অজিৎ রাজকুমাব বাবুব গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "মামা বাবু! মা কি আমাব স্বর্গে আছেন? আমিও কি সেখানে যাব।"

রাজকুমার বাবু। হ্যাঁ। আমবা সকলেই এক দিন সেখানে যাব।

তার পর বিকালে রাজকুমার বাবু ইন্দুরেখা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ! বই খানা কি এখনই অজিৎকে দিব।"

ইন্দুরেখা দেবী। হ্যাঁ! দেবে বই কি। এখনই তাকে দেওয়া যাক্।

তাঁহারা অজিৎকে ডাকিয়া বলিলেন "অজিৎ! এই নাও। এখানা তোমার দাদা মহাশয়ের বই, তোমাব মাযেব বই, এখন ইহা তোমার ও তোমার দিদীব বই। তোমাব মা এখানা তোমাকে আর তোমাব দিদীকে দিযা গিযাছেন।" অজিৎ বই খানাকে লইয়া বাব বাব চুম্বন করিযা বুকে চাপিয়া ধবিল। বই খানা খুলিযা দেখে তাহাতে লেখা বযেছে "প্রাণেব অজিৎ ও উর্মিলাকে মায়ের ভালবাসাব উপহাব। কিরণমালা বায়।" এই লেখাটী পড়িযা মাব মাকে দেখিবাব জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইল কিন্তু ইচ্ছা কবিলে কি হইবে; মাকে ত আব দেখিবাব উপায নাই।

রাজকুমাব বাবু কিছুদিনের মধ্যে ইটের চকে যাইবেন ঠিক কবিলেন। অজিৎ তাঁহার যাইবাব কথা শুনিযা তাঁহাব সঙ্গে যাইবাব জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিযা বলিল, "মেসো মহাশয়! না—না মামা বাবু! আমি যাব। আমি দিদীকে খুঁজিতে যাব।" (অজিৎ প্রাযই ভুলিয়া মেসো মহাশয মাসীমা বলিযা ফেলিত)। অজিতের যাবাব নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া, রাজকুমাব বাবু তাহাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তখন অজিতেব আহ্লাদ দেখে কে? সে হাতে তালি দিতে দিতে, নাচিতে নাচিতে, বাগানে ছুটিয়া গেল। যাইতে যাইতে দেখে যে বুড়ো চাকব কালাচাঁদ সেই দিকে আস্‌ছে। কালাচাঁদ অজিৎকে নাচিতে দেখিযা জিজ্ঞাসা করিল "দাদাবাবু! তোমাব আজ এত আহ্লাদ কেন?"

অজিৎ। কালাচাঁদ! আহ্লাদ হবে না? আমি মামা বাবুর সঙ্গে ইটেব চকে যাব। তুমি আমার গাছ গুলোতে জল দিও। যত্ন করো। বুঝেছ?

কালাচাঁদ গাছে জল দিতে স্বীকৃত হইল। তখন অজিৎ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিযা যাইবাব জন্য সব জিনিষ ঠিক করিতে লাগিল। পড়িবার বই লইল। তাহাব খেলিবাব যত জিনিষ লইল। রাণীর কাছে বিদায় লইল। অজিৎ রাজাব গলা

জড়াইয়া বলিল "বাঞ্জা! ভাই! ইটের চকে যাব। আমার কেমন মজা হবে। তুমি থাকলে—মামীমা একলাটী রহিলেন; তার কাছে থেকো। আহা! বেচারি মামীমা একলা থাকিবেন। আমি, মামা বাবু দুজনেই চলে যাব। কেবল তুমি আর মামীমা থাকবে। তুমি আমার ছোট ভাই। তুই যাদু! তুই সোনা! তুই বাছাধন!" বাঞ্জা সব বুঝিল!! আহ্লাদে লেজ নাড়িতে নাড়িতে অজিতের কোলে লাফাইয়া উঠিল।

অজিৎ বুঝিল বাঞ্জা সম্মত হইয়াছে। এই প্রকারে অজিৎ বাঞ্জার সহিত আলাপ করিতেছে, এমন সময় ইন্দুরেখা দেবী কি কাজে সে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিযাই অজিৎ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা ধরিয়া চুম খাইয়া বলিল "মামীমা। আমি ইটের চকে চলে গেলে, তোমায় একলা থাকতে হবে না, বাঞ্জা তোমার কাছে থাকবে। আমি শীঘ্রই মামা বাবুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিব। আমি এখন যাবার ঠিক করিতেছি।"

ইন্দুরেখা দেবী অজিৎকে দেখাইবার জন্য মুখ খানি ভার করিয়া বলিলেন, "আর যাও। তুমি আমায় ফেলে চল্লে। আমি কি করে একলা থাকব। অজিতের মায়া দয়া নেই। বাঞ্জাকে লইয়া কি করিব? 'বাঞ্জা' কি আমার অজার মত।"

অজিৎ মামীমার মুখ ভার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তাহার চোখ্ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। সে কাঁদ কাঁদ হযে বলিল "তুমি যদি কাঁদ আর দুঃখ কর, তাহলে আমি আর যাব না, তোমার কাছে থাকব।" এই কথা শুনিয়া ইন্দুরেখা দেবী হাসিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "না! না! তুমি যেও। 'বাঞ্জা' আমার কাছে থাকবে। আমি যাই; কাজ ফেলে এসেছি। তুমি আপনার কাজ কর। পড়া করে রাখ, দুপুর বেলা পড়া নেব।" এই বলিয়া তিনি আপনার কাজে চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে রাজকুমার বাবু অজিৎকে সঙ্গে করিয়া ইটের চকে গেলেন। ইন্দুরেখা দেবী কিছুদিনের জন্য একলা বাড়ীতে রহিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

অজিৎ হাসিতে হাসিতে ললিত বাবুর বাড়ী নামিল। আজ তার আহ্লাদ দেখে কে? "মেনাকে দেখিব" "রামদাসকে দেখিব" "দিদীমাকে দেখিব" এই ভাবিয়াই সে আহ্লাদে আটখানা। অজিৎকে মেনাদের বাড়ী রাখিয়া রাজকুমার বাবু ও ললিত বাবু আবার ঊর্ম্মিলার সন্ধানে বাহির হইলেন। হাসপাতালে গিয়া দেখেন তাহাদের খাতায় লেখা রহিয়াছে তিনি রোগ মুক্ত হইয়া চলিয়া গেছেন। কোথায় যে গেলেন তার আর ঠিক নাই। আহা! তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন খোঁজ পাইলেন না। রাজকুমার বাবু ললিত বাবুর উপর ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু অজিৎ কোনমতেই যাইতে চাহিল না। সে বলিল "আমি দিদীকে লইয়া একসঙ্গে বাড়ী যাব, মামা বাবু! আমি এখন যাব না।"

সুষমা দেবীও বলিলেন "থাক্! বিনয়ের (ললিত বাবুর ছেলের) সঙ্গে খেলা করিবে! কিছুদিনের জন্য থাকিতে ইচ্ছা হয়েছে, থাক্।" রাজকুমার বাবু কাজেই অজিৎকে রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অজিৎ যায় নাই বলিয়া ইন্দুরেখা দেবী কিছু কষ্ট পাইলেন। অজিৎ এখানে প্রত্যহ মেনার কাছে যায়। কত খেলা করে, তার সঙ্গে কত বই পড়ে। রামদাসের কাছে যায়। দিদীমাও ফাঁক যান না। এই কদিন অজিতের খুব আনন্দে কাটিয়া গেল।

একদিন অজিৎ রামদাসের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময় কে একটী মেয়ে ঘরের সামনে দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রামদাস বলিয়া উঠিল "কেগা। উমু নাকি ?"

বালিকা। হ্যাঁ আমি। এই দোকানে খাবার কিন্‌তে যাচ্ছি।—তাহাকে দেখিয়া অজিৎ বলিয়া উঠিল "ও কে, কার মেয়ে, রামদাস ?

রামদাস। আহা! বাবা! ওর কেউ নাই। ওর ত্রিসংসারে কেউ নাই। মেয়েটীর কেউ নাই। মেয়েটী বড় ভাল।

অজিৎ। ও কার কাছে থাকে। এতটুকু মেয়ে একলা থাকে ? ওর ভয় করে না ?

রামদাস। আর কেইবা ওর কাছে থাক্‌বে ? ও চিরকাল কি একলা আছে ? এতদিন এর আগে ও নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। তিনি মারা যাবার পর নবকুমার বাবুর স্ত্রী একদিন ছাত থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, তিনি আর ফিরে আসেন নাই। তারপর বাড়ীওয়ালা বেচারিকে তাড়াইয়া দিল। তারপর হেথায় হোথায়, পথে ঘাটে, এর বাড়ী, তার দুয়ারে, এমনি করে বাছা মানুষ হচ্ছে। তুই বাছা যেমন কষ্ট পেতিস্, উমুও তেমনি কষ্ট পায়। ভগবান তোর শুভদিন এনে দিলেন, তোর কপাল ফিরে গেল। এর আর কি তা হবে। এর আর কি কপাল ফির্‌বে। চিরটাকাল এই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে এ প্রাণটা যাবে। আহা! কচি প্রাণে কি এতই সয় ?

অজিৎ। কি রামদাস ? তুমি বল্লে এ কার কাছে ছিল না ? তার নাম কি ? বলনা ?

রামদাস। নব কুমার বাবু। তা শোনবার জন্য অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

অজিৎ। কি বল্লে, নবকুমার বাবু ? (বালিকার প্রতি) তোমার নাম কি ?

বালিকা আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বলিল "আমার নাম উর্ম্মিলা।"

অজিৎ। উর্ম্মিলা!! উর্ম্মিলা!!! দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি আস্‌ছি।

এই বলিয়া সে প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ী গেল। তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ললিত বাবু সুরমা দেবী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অজিৎ, কি হয়েছে? অত ছুটে আস্‌ছ কেন ?"

অজিৎ। মামাবাবু। মামাবাবু!! দিদী! দিদীকে পেয়েছি। আসুন। আসুন। তাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সে নিশ্চয় আমার দিদী। তার নাম উর্ম্মিলা। সে নবকুমার বাবুর কাছে ছিল। সব মিলেছে। সব মিলেছে। মামাবাবুকে টেলিগ্রাম করুন। দিদীকে পাওয়া গিয়াছে।

ললিত বাবু। থাম। থাম। অত ব্যস্ত কেন ? ঠাণ্ডা হও, তারপর বলিও। কাকে দিদী করে এলে তার ঠিক নাই।

অজিৎ। কাকেও দিদী করি নাই। দিদীকেই দিদী করিয়াছি। সে আমার দিদী। সে আমার দিদী।

সুরমাদেবী।—আচ্ছা তোমার মামা বাবু যাচ্ছেন। যাও না গা, ওর সঙ্গে যাও। আহা! বেচারা অত করে ছুটে এসেছে।—সত্য সত্যই বোধ হয় উর্ম্মিলাকে পাওয়া গেল।

ললিতবাবু।—তুমি কি পাগল। আমি কি যাবনা বলেছি, আমি এই যাচ্ছি। চল অজিৎ! যাই। দেখিগে তোমার দিদী কেমন।

অজিৎ ছুটাছুটী রাস্তা দিয়া চলিল। আজ তার সঙ্গে চলে সাধ্য কার ?

ললিতবাবু বার বার বল্‌ছেন—'অজিৎ। অজিৎ! একটু আস্তে'; অজিতের কি সে কথা আর কাণে যায়। ললিত বাবুর আস্তে যেতে বলা

অন্যা বোধ হয় তিনি অমন অবস্থায় পড়লে ওব হইতে তাড়াতাড়ি ছুটাছুটি যাইতেন। যাহোক ঝড়েব মত, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অজিৎ বামদাসেব ছোট কুঁড়ে ঘব খানিতে গিয়া উপস্থিত হইল। ললিতবাবুও মিনিট কতক পবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজিৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "এই। এই। এই দেখুন। এই দেখুন।"

ললিতবাবু।—অত ব্যস্ত কেন? দাঁড়াও। বেচাবি ভয় পাবে যে? কি গো বাছা। তোমাব নাম কি? তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? এখন কোথায় আছ সব বল তো?

উর্ম্মিলা আস্তে আস্তে ধীবে ধীবে সব কথা বলিল। যখন উর্ম্মিলা ললিত বাবুর সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তখন অজিৎ আগ্রহেব সঙ্গে কাণ পাতিয়া সব কথাগুলি শুনিতেছিল। আব এক এক বাব আহ্লাদে অস্থিব হইয়া যাইতেছিল। এখন উর্ম্মিলা অজিতেব কে পাঠক পাঠিকা তোমবা কি তাহা শুনিতে চাও? তবে শোন। উর্ম্মিলা আব কেহই নয় অজিতেব দিদী। অজিৎ একথা জানিতে পাবিয়া কি কবিল, তাহাও বোধ হয় জানিবাব জন্য তোমবা উৎসুক হইয়াছ। তোমবা হলে কি কবিতে ভাব দেখি। যাহা সকলেই কবে থাকে, অজিৎ তাহাই কবিল। অজিৎ ছুটিয়া গিয়া গলা জড়াইয়া তাহাব মুখে বাব বাব চুম্বন কবিল। উর্ম্মিলা অবাক হইয়া বহিল। আজ আব তাব মুখ দিয়া কথা বাহিব হয না। আজ তাব মন আর বিশ্বাস কবিতে চায় না, যে তাহাব শুভ দিন আসিযাছে। আজ তাব দুটি চোখ দিযা কে জানে কেন দব দব কবিযা জল পড়িতে লাগিল।—উঃ দুঃখিনী কি এত সুখ সহ্য করিতে পারে? কি ঘোব পবিবর্ত্তন। সে এক দৃষ্টে ভাইয়েব মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অজিৎ যে এত আদব কবিল, তার আর কি প্রতিশোধ দিবে? তাব প্রাণ আজ পবিপূর্ণ। আজ তাব পৃথিবীতে আপনাব লোক হইল। উর্ম্মিলা তোমায় ও প্রাণখানি কি এত সহ্য কবিতে পাবিবে? উর্ম্মিলাব মাথা ঘুবিতে লাগিল। সে চাবিদিক অন্ধকাব দেখিতে লাগিল। এ কি সামান্য সুখেব কথা, যে এমন সুন্দব ছেলেটা তাব ভাই। আপনাব ভাই। উর্ম্মিলা অধীব হইয়া মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। কিছু ক্ষণেব জন্য আব একটীও কথা সবিল না। পবে উর্ম্মিলা কিছু সুস্থিব হইলে ভাইকে লইয়া আপন ঘব দেখাইল, কত কত দুঃখেব কথা বলিল।

তৎক্ষণাৎ ললিত বাবু গিয়াই বাজকুমাব বাবুব কাছে টেলিগ্রাম কবিলেন। বাজকুমাব বাবু ইন্দ্রলেখা দেবীকে সঙ্গে কবিয়া সেই দিনই ইটেব চকে আসিলেন। তাঁবা উর্ম্মিলাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিছু দিন সেখানে থাকিয়া, উর্ম্মিলাকে লইয়া বাড়ী ফিবিয়া গেলেন।

কি আশ্চর্য্য মিলন। কি সুন্দব দৃশ্য।—আজ হতে উর্ম্মিলাব সুখেব দিন আসিল। মামা মামীব আদবে ভাইযেব স্নেহে অতি সুখে তাহাব দিন যাইতে লাগিল। জ্ঞান, ধর্ম্মে, গুণে উর্ম্মিলা শীঘ্রই উন্নতি লাভ কবিল।

অজিতেব সুখেব দিন পূর্ব্বেই আসিযাছিল। উর্ম্মিলাবও সুখেব দিন আসিল। দয়াময় পবমেশ্বরেব রাজ্যে কাহাবও চির দিন কি দুঃখে যায?

দুষ্ট বাঘ।

একটা বাঘ রাজবাড়ীব সিংহ-দরজার সম্মুখে একটা খোঁয়াড়ে বদ্ধ ছিল। রাজার বাড়ীতে কত লোক যায়, বাঘ সকলকেই হাত যোড় করিয়া বলে "দোহাই দাদা। তুমি বড় ভাল লোক; তোমাকে
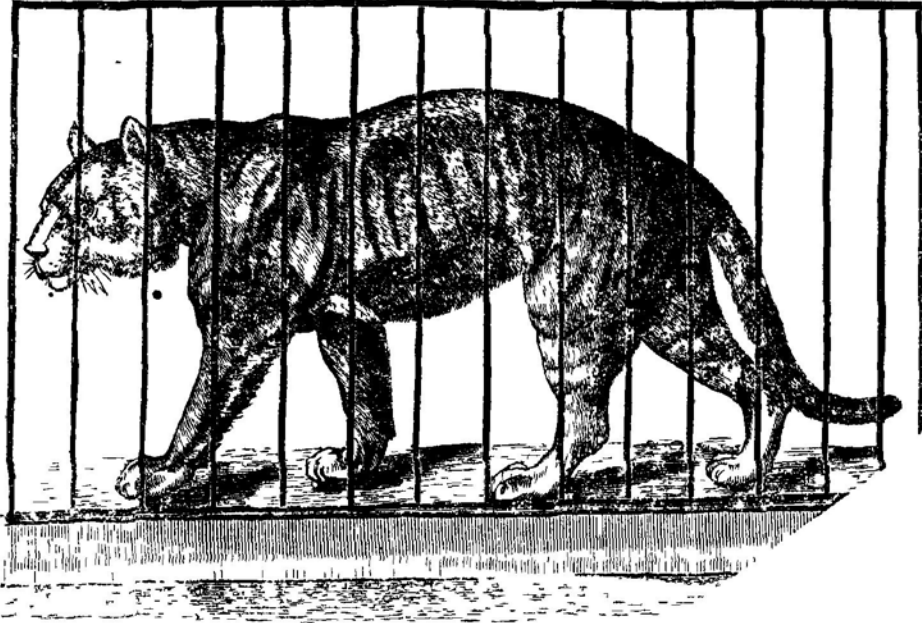
আমি বড ভাল বাসি, আমাকে বাহির করিয়া দাও।”. কেহই কিন্তু দরজা খুলিয়া দেয না। অবশেষে এক ফলাবে বামণ বাজবাডীতে ভিক্ষা কবিতে যাইতেছিল, তাহাকেও ঐ কথাগুলি বলিল। ঠাকুব বলিল “তুমি বাঘেব জাত, তোমাকে কি বিশ্বাস কবিতে আছে? আমি দবজাটা খুলিলেই তুমি আমাকে ফলাব করিয়া বসিবে।” বাঘ বলিল “না ভাই, তোমাকে কি ফলার কবিতে আছে? তুমি কত ভাল লোক! রাজ্যব বাড়ীতে নিবামিষ খাইযা খাইয়া আমি বৈষ্ণব হইযা গিয়াছি, আমি আব এখন মাংস খাইনা। দোহাই ঠাকুব মশাই। তোমাকে দশ হাজাব টাকা দিব, দবজাটা খুলিয়া দাও।”

ইহা শুনিয়া ঠাকুর একবাব বিশ্বাস করিল, একবার অবিশ্বাস করিল, তার পর দরজা খুলিয়া দিল। বাঘ বাহির হইয়াই বলিল “ঠাকুর তোমাকে খাইব।” শুনিয়াইতো ঠাকুরের প্লীহা কাঁপিয়া গেল। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ঠাকুর বলিল “আচ্ছা ভাই। আমাব তিন জন সাক্ষী আছে; তাবা যদি বলে, তবে খাইও।” বাঘ স্বীকৃত হইল। দুজনে কতদুর গেলে পর ঠাকুব একটা বট গাছ দেখাইযা বলিল, “এই আমাব একজন সাক্ষী।” এই কথা বলিযা বট গাছকে জিজ্ঞাসা কবিল “ভাইবে, উপকাবীব অনিষ্ট কি কেউ করে?” বট গাছ বলিল “কবে বই কি? সকলেই কবে। এই দেখ আমার ছায়ায় বত পরিশ্রান্ত পথিক লোক বসিয়া ঠাণ্ডা হয়, আবাব তাহারাই যাইবাব সময় আমাব ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়।” বাঘ বলিল “কি ঠাকুর।” ঠাকুর একটু বিপদে পড়িল। আব দু জন সাক্ষীও যদি ঐরূপ বলে তাহা হইলেই তো গোল!

আর কতদুর যাইয়া একটা ক্ষেতের আ’লকে জিজ্ঞাসা করিল “বল দেখি ভাই, উপকারীর অনিষ্ট কে করে?” আ’ল উত্তর করিল “সকলেই করে। দুই চাষার ক্ষেতের মধ্যে আমি থাকি। বাড়ী ঘর কিছুই নাই। বৃষ্টিতে ভিজিয়া আর

রৌদ্রে শুকাইয়া তাহাদের এক জনই ক্ষেত আর একজন যাহাতে না লইয়া যাইতে পারে তাহাই করি। তবু হতভাগাদের কেমন বুদ্ধি, দু পাশে দুই বেটা লাঙ্গল দিয়া আমার গা কাটিয়া নিজের ক্ষেত বাড়াইতে চায়। তুমি ঠাকুর কেমন বোকা। কোন দিন কি কাহারও উপকার করিয়া ঠক নাই?" বাঘ একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর মশাই, কেমন বুঝ?" ঠাকুর কি করে, সে চুপ করিয়া থাকিল।

আর কতক দূর যাইয়া এক শেয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শেয়াল বাঘের গন্ধ পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াছে। বামণ অনেক ডাকাতে সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কাছে আসিয়া কাজ নাই। যাহা বলিতে হয় এখান হইতেই বল।" ঠাকুর তাহার অবস্থা সমুদায় খুলিয়া বলিল। শেয়াল মনোযোগ দিয়া শুনিয়া একটু মাথা নাড়িয়া বলিল "বড় বোকার কর্ম্ম করিয়াছ ঠাকুর। তোমার মোকদ্দমা ও বড় কঠিন, বোধ হয় মামারই (বাঘ শেয়ালের মামা এ কথাটা সকলেই জানে) জিৎ হইবে। কিন্তু না দেখিয়া শুনিয়া আমি কোন রকম মতই দিতে পারিব না। এই মোকদ্দমার সুবিচার করিতে হইলে, ইনি কোথায় কিরূপ ভাবে বদ্ধ ছিলেন আর তুমিই বা কিরূপে দরজা খুলিলে, সমস্ত স্বচক্ষে দেখা আবশ্যক। সুতরাং আমার মত, ঐ স্থানে পুনরায় যাইয়া মামাকে পুনরায় খোঁয়াড়ে যাইতে দেখিয়া সব মীমাংসা করা হউক।"

এই পরামর্শ স্থির হইলে পর তাহারা তিন জনে সেই খোঁয়াড়ের কাছে আসিল। বাঘ খোঁয়াড়ের ভিতর গেল। শেয়াল স্বহস্তে খিল আটিয়া দিল। তার পর ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে যাইয়া দৈ চিড়ে খাইতে উপদেশ দিয়া যোড় হাতে মামাকে বলিল "মামা, সেলাম।"

এই গল্পটী হইতে আমরা এক উপদেশ পাই যে দুষ্ট লোকের উপকার করিলেও তাহার নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাইব এরূপ আশা করা যায় না। খারাপ লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করিওনা।

আজ বাঘের সম্বন্ধে একটী মিথ্যা গল্প বলিয়া তোমাদিগকে একটু আমোদ দিতে চেষ্টা করিলাম। সম্পাদক মহাশয় অনুমতি করিলে এবং সময় হইলে ভবিষ্যতে আর এক দিন সত্য গল্প বলিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

সম্পাদকের পত্র।

(দ্বিতীয় পত্র।)

খা-সম্পাদকের দ্বিতীয় পত্র আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিলাম।— আমার প্রিয়বালক বালিকাগণ।

যাহা দেখি সবই যদি খুলিয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না, কিন্তু আমার সে সাধ্য নাই। বড় হইয়া নিজে যদি কখনও দেশে বিদেশে বেড়াইতে পার এবং ভাল চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পার, তবেই বুঝিতে পারিবে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কত সুন্দর, কত মধুর, কত চমৎকার।

আমি যেখানে আছি, এখান হইতে এক ক্রোশ দূরে কয়লার খনি আছে। খনি কাহাকে বলে জান? এক একটা যায়গার অনেক দূর পর্য্যন্ত মাটীর নীচে কয়লা পাওয়া যায়, এই কয়লাতে সমস্ত বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ কল চলে, লোকে মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া, মাটীর নীচে দিয়াই বরাবর পথ করিয়া কয়লা তুলিবার বন্দোবস্ত করে। ইহারই নাম খনি বা খাদ। মাটীর অনেক নীচে পর্য্যন্ত কয়লা থাকে, এই জন্য দুতলা, তিন তলা, চারতলা, এই রকম তলা থাকে। কোন কোন খণিতে অনেক তলা আছে, শুনিতে

পাওয়া যায়। আমরা যেটাতে গিয়াছিলাম, সেটা ছোট, তাহাতে দুতলা বই নাই।

আমি ঘোড়ায় চড়িয়া খনি দেখিতে গিয়াছিলাম। খনিতে নামিবার রাস্তা ক্রমে ঢালু হইয়া নীচে গিয়াছে, সুতরাং বেশ হাটিয়া যাওয়া যায়। নামিবার দুরজাটায় একটু আলো আছে বটে; কিন্তু মধ্যে আলো জ্বালিয়া যাইতে হয়।

আমাদের সঙ্গে কয়লার খনির একজন লোক আলো ধরিয়া যাইতেছিল, সুতরাং আমরা নির্ভয়ে যাইতে লাগিলাম। দু পাশে কয়লার দেওয়াল, উপরে কয়লার ছাদ আঁটা, নীচে কয়লার রাস্তা,—আমরা এইরূপ স্থানে এইরূপ পথে সাবধানে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু একটা বিপদে পড়িলাম। খনির মধ্যে তো বাতাস যাইবার যো নাই, সুতরাং তোমরা বুঝিতেই পার সেখানকার বাতাস লোকের নিশ্বাসে নিশ্বাসে কত ভারী হইতে পারে। আমার কিছু কষ্ট হইতে লাগিল, আর দুতলায় নামিতে ইচ্ছা করিলাম না। সঙ্গের আলো-ধারী লোককে বলিলাম "বাপু! আমাদিগকে বাহির করিয়া লইয়া চল, আর নীচে যাইব না।" কিন্তু বাহির হইবার রাস্তা তো সহজ নয়। দেখিতে দেখিতে চলিতে চলিতে, অনেক পথ গেলে তবে বাহির হইবার রাস্তা পাওয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে কি কি দেখিলাম তাহা বলি। খনির অনেক যায়গাতেই সোজা হইয়া চলিয়া যাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও কোথাও কুঁজো হইয়া চলিতে হয়। আমরা কখনও কুঁজো হইয়া কখনও সোজা হইয়া চলিতে চলিতে দেখিলাম মজুরেরা কয়লা কাটিয়া বাহির করিতেছে, তাহাদের কাছে একটা আলো এবং হাতে এক এক খানা মাটী-খোঁড়া কুড়াল। মজুরদের মধ্যে দুই এক জন স্ত্রীলোক এবং অনেক বালক দেখিলাম। সেখানে সাদা কালো নাই, সবই কালো দেখিলাম। অনেক সুশ্রী ছেলে কয়লাতে এমনি কালো হইয়া গিয়াছে, যে ঠিক যেন চুনাগলির কালো পোষাক পরা ফিরিঙ্গী। যেখানে কয়লা কাটা হইতেছে তাহার নিকটে সরু রাস্তা, তাহাতে কয়লা টানিবার জন্য রেল ফেলা। কয়লা কাটা হইলে বড় বড় টিনের বা লোহার বাল্‌তিতে বোঝাই করিয়া, রেলের উপরে খোলা ঠেলা গাড়ীতে বসাইয়া দেয়, সেখান হইতে অল্প ঠেলিয়া দিলেই কয়লার গাড়ী, যেখানে উপরে উঠিবার রাস্তা, সেই পর্য্যন্ত চলিয়া আসে, কখনও বা লোকেও ঠেলিয়া সে পর্য্যন্ত লইয়া যায়। উঠিবার রাস্তা সিঁড়ির মতন মনে করিতেছ বুঝি? না, না, তাহা নয়। আমরা এখন যেখানে পৌঁছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম উপরের সূর্য্যের আলো দেখা যাইতেছে। এবং উপর হইতে লম্বা একটা লোহার শিকল নামিতেছে। এই শিকলের শেষভাগটার তিনটা মুখ। এই তিনটা মুখ বাল্‌তির চারিদিকের তিনটা কড়ার সঙ্গে যুড়িয়া দেওয়া হইল, আর সঙ্কেত করিবামাত্র বাল্‌তি কয়লাশুদ্ধ উঠিয়া চলিয়া গেল। আবার বাল্‌তি ফিরিয়া আসিল। এইবারে আমরা তাহাতে দাঁড়াইয়া শক্ত করিয়া শিকল ধরিলাম, পাশের লোকেরা উপর দিকে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"আস্তে, মানুষ বাল্‌তি, আর অমনি আমরা আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেলাম। কোথায় নামিয়া ছিলাম, আর কোথায় আসিয়া উঠিলাম, চাহিয়া দেখি, একটা বাষ্পীয় যন্ত্র কপিকলে করিয়া আমাদিগকে টানিয়া তুলিয়াছে এবং আমরা যেখান দিয়া নামিয়াছিলাম, তাহা হইতে বহুদূরে আসিয়া উঠিয়াছি।

কয়লার খনিতে বিস্তর টাকা লাভ হয়, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সেদিকে মতি নাই। যত কয়লার খনি, হয় গবর্ণমেণ্টের না হয় রেলওয়ে কোম্পানির না হয় অন্য কোন ইংরেজ কোম্পানির। আমরা যে খনি দেখিতে গিয়া-

ছিলাম, সেই যায়গাটা এখানকার টিক্রাইতের ছিল, কিন্তু তিনি নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কিছু করিতে না পারিয়া নয় লক্ষ টাকা মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন, আর এখন কত নয় লক্ষ টাকা তাহা হইতে লাভ হইবে, কে জানে?

কিন্তু বিনা পরিশ্রমে, বিনা যত্নে, বিনা কষ্টে কি কখনও কোন কাজ হয়? খনি হইতে কয়লা উঠাইতে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, কখনও কখনও মজুরদের হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। অন্ধকারে সামান্য আলোতে কাজ করা, সহজেই বুঝিতে পার, কত বিপদের সম্ভাবনা। আবার ইহা ছাড়া, খনিতে আর একটা মহা বিপদের ভয় আছে। খনির মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাতাস ঢুকিতে না পাবায় মধ্যের হাওয়া খারাপ হইয়া গিয়া লোকের নানারূপ ব্যারাম হইয়া থাকে এবং মধ্যের খারাপ হাওয়া কখন কখন প্রদীপের আলো লাগিয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন মজুরদের প্রাণে বাঁচা শক্ত। যদিও এই শেষের লিখিত বিপদ বারণ করিবার জন্য, আজ কাল "অভয়-প্রদীপ" নামে এক রকম নূতন আলোর সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু আমরা এই খনিতে তাহার একটীরও বন্দোবস্ত দেখিলাম না।

এখন শ্লেট-পাথরের নদীর কথা কিছু বলিব। এই নদী আমার থাকিবার যায়গা হইতে আধ মাইলের অধিক হইবে না, সুতরাং আমি হাটিয়াই গেলাম। নদী বলিলে যদি তোমাদের গঙ্গা বা অন্য কোন নদীর কথা মনে হয়, তাহা হইলে আমি 'নদী' না বলিয়া অন্য কিছু বলি, কেননা আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার উপর দিয়া পথ গিয়াছে, এবং গরু, মহিষ, গাড়ী, ঘোড়া, তাহার উপর দিয়াই যাইতেছে। উপরে এক হাত কি দেড় হাত বালি আর তাহার নীচে চমৎকার শ্লেট-পাথর। আমরা দেখিলাম, নদীর যে ভাগের উপর দিয়া পথ হইয়াছে, সেখানে ঝির্ ঝির্ করিয়া একটু একটু জল আসিতেছে, আরও নীচে আসিয়া তাহার সহিত এইরূপ দশ যায়গা হইতে দশটী ছোট ছোট জলের স্রোত আসিয়া মিশিয়াছে এবং সকলগুলি এক হইয়া একটু তেজের সহিত পাথর ডিঙ্গাইয়া কুল্ কুল্ শব্দে নীচে চলিয়া যাইতেছে। আমরা এইখানে একটা পাথরের উপরে বসিলাম, এবং সেই নির্জ্জন স্থানের সুন্দর শব্দ শুনিতে শুনিতে মনে মনে মহাসুখী হইতে লাগিলাম। এখানে জলের তেজে বালি দাঁড়াইতে পারে না, কেবল কালো পাথরের উপর দিয়া সাদা জল সূর্য্যের কিরণে চিক্ চিক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। শ্লেটপাথরগুলি এমন সুন্দর ভাবে সাজান, তাহা আর কি বলিব? কোন যায়গাটা ত্রিকোণ, কোন যায়গাটা অর্দ্ধচন্দ্রের মত, কোন যায়গাটা চারিকোণ, এইরূপ নানারূপ সুন্দর ভাবে সাজান রহিয়াছে। শ্লেট পাথরে সুন্দর লেখা যায়, আমি এক খণ্ড পাথর লইয়া বড় একটা পাতের উপর লিখিলাম "ঈশ্বরের কি দয়া!" আর তাহার উপর দিয়া শীতল জল ঝির্ ঝির্ করিয়া যেন সেই লেখা দেখিতে দেখিতে নামিয়া চলিল।

একবার ইচ্ছা হইল, এই সকল জল কোথা হইতে আসিতেছে তাহা খুঁজিয়া দেখি। এই ভাবিয়া পাথরের নুড়ি কুড়াইতে কুড়াইতে নদীর যেদিক হইতে জল আসিতেছে, সেই দিকে চলিলাম। অনেকদূর গেলাম, তখনও শেষ নাই। আরও একটু আগে গেলাম, কিন্তু সেখানে জানোয়ার গায়ের যেমন গন্ধ সেইরূপ গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। আমরা সেই 'বোট্কা" গন্ধে ভয় পাইয়া, আর যাইতে সাহস করিলাম না। আর একটু গেলেই হয়ত এখন যে সকল কথা লিখিতেছি, তাহা আর লিখিবার লোক থাকিত না। আমরা বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আরো অনেক কথা বলিবার রহিল, বারান্তরে তোমাদিগকে জানাইব।

পচম্বা, গিরিধি। } তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সম্পাদক।

ধাঁধা।

গতবারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১।—রিপ্লাই পোষ্টকার্ড। ২।—ছাতা। ৩।—প্রজাপতি। ৪।—বাতাস। ৫।—অ অ-গৌরব (কেন না, যাঁর সদ্গুণ আছে তিনি নিজের প্রশংসা কখন করেন না, আর যে নিজের সুখ্যাতি করিয়া বেড়ায়, নিশ্চয় তার গুণ বা গৌরব কিছুই নাই।)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ২...ঁ চৌরিঙ্গী...লেন, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।